প্রকাশ : অপর। সম্পাদক : সোমনাথ মুখোপাধ্যায়। জুন ১৯৯৬। লেখার সময় '৯১ থেকে '৯৬।

বুলা, তোমাকে

ত্রিদিব সেনগুপ্ত

বইমেলাফেরত কিশোরী তার পার্শ্ববর্তিনীর জানলার সরু ফাঁক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাওয়া ফোলানো-চুল মাথা ঘুরিয়ে আনল। দেখাচ্ছে তার প্রাসাদ, নীল মেঘ, প্রাসাদ, বড় বড় তোরণ, কত গাছ, পাহাড়ের গা বেয়ে শুঁড়িপথ। শুঁড়িপথ দিয়ে চলে যায় ঘোড়া, ঘোড়সওয়ার। ঘোড়ার নাকে এসেছিল শিশিরের গন্ধ, গাছে গাছে অন্ধকার লতায় লতায় ছাওয়া ছায়াআরাম বুনো আগাছার পাতার স্বপ্রভ রোঁয়ায় সেঁটে যাওয়া শিশিরের গন্ধ। কিশোরী পাতা ওল্টাল। এই পাতায় কোনো ছবি নেই।

মিনিবাস নড়ে, ভিড় কমছিল। সামনের সিটে নীল সোয়েটার আর টুপিতে মোড়া বাচ্চা তার ঝুলে থাকা ঘুমন্ত হাতের আঙুল কোঁকড়াল, আর স্বপ্নের কোনো ক্রিয়ায় তার ঠোঁট নাড়ল, বাইরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল বাবার ঘাড়ের দিকে : স্বপ্ন যদি ভেঙে যায়।

আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, দৃশ্যের পর দৃশ্য, আমার দৃষ্টি কুয়াসার মত ভাসে আমার চোখের সামনে। আর চোখের কোটরে জ্বালা করে। অন্যমনস্কতা ভেঙে আবার তোমাকে লক্ষ্য করছি। তুমিও দাঁড়িয়ে। এখন তুমিও কত ছোট। একটু আগেই তোমাকে দেখলাম। বাসস্টপ থেকে দূরে ময়দানে ধুলোঢাকা গাছের পাতায় মিশে যেতে। তোমার চুলও ধূসর, মাঝেমাঝেই যেমন ধূসর হয় তোমার চুল, তুমি মিশে যাচ্ছিলে পাতায় ধুলোয় আর হ্যালোজেন আলোর রোশনাইয়ে।

এখন তুমি ছোট। তোমার রুবিয়া ভয়েলের টুকটুকে লাল ফ্রকের নিচে হাঁটুর ভাঁজটা চোখে পড়ে, ভাঁজের চিহ্ন, টানটান পায়ের পিছনে, আমি তোমার পেছনে গিয়ে দাঁড়াই। পেছনে, পাশে। তুমি মন দিয়ে তোমার কাজ করে চললে। ঝুলনের পাহাড় সাজাচ্ছ : পাহাড়, লোকালয়, গ্রামাঞ্চল, নদী। পাথরের টুকরো কাল আমিই কুড়িয়ে এনে দিলাম। আর বালি, অভ্র-মেশা চিকচিকে। আর তোমার বাবার কন্ট্রাক্টরি-ফেরত নষ্ট জমাট-বাঁধা হোয়াইট সিমেন্টের পিণ্ড। আমি জিগেশ করলাম, 'প্লাস্টার অফ প্যারিস'? তুমি কোনো উত্তর দাওনি।

তুমি কি কোনোদিন আমার কোনো প্রশ্নের উত্তর দাও, বুলা?

আমি তোমায় সাহায্য করছি। আমি তোমায় সাহায্য করছি।

বালির মধ্যে সিলিকন। তুমি বালিতে বসলে হাঁটু গেড়ে। আমি তোমার প্রাকযৌবন রোগা সুঠাম কাঁধ আর ঘাড়ের খুব কাছে আমার মুখ নিয়ে গেছি। তোমার চারপাশে উত্তাপ ছড়াও তুমি, ছড়াচ্ছ। উত্তাপে উত্তাপে বালির পাহাড় কাঁচ হয়ে গেল। বালির পাহাড়ে বসানো দোলনাও কাঁচ। সামনে, মাটি আর ঘাস সাজানো কৃষিক্ষেত্রের ট্রাক্টরও কাঁচ। সব কাঁচ। পৃথিবী কাঁচের হয়ে গেল। কাঁচ, স্বচ্ছ কাঁচ।

বুলা তোমার খুব কাছে গেছি। তোমার কানের পাশে খুব ছোট ছোট করে ছেঁটে-দেওয়া চুলের রুক্ষ নরম গোড়া, খোঁচ খোঁচ, কালই কাটা হয়েছে, চামড়ার নরম জমিতে ছড়ানো ছোটানো লম্বাটে বিন্দুর মত। আমি তোমার আরো কাছে। আমি বুঝিনা তোমার কাছে গেলেই আমার শ্বাস কেন বন্ধ হয়ে আসে? কেন নাকের পাটা আর কান এত গরম বোধ হয়? আমি বুঝিনা বুলা। কেন এমন হয়?

আমার কপালটা ঠেকাতে ইচ্ছে করে তোমার গোল করে কাটা ফ্রকের পিঠে নরম চকোলেট কালো চামড়ায় খোলা বারান্দার সকালের মার্চ-উজ্জ্বল আলোয় ছোট ছোট চিকচিকে সোনালি লোমে। আমি ঠেকাই-না, ভয় পাচ্ছি, গা শিরশির করে — ঠেকাতে ঠিক ইচ্ছে করছে কিনা তাও আমি ভাল জানিনা।

আমরা দুজন। আমাদের চারপাশে বেড়ে উঠছে গজিয়ে উঠছে কাঁচ আর কাঁচ। আমরা দুজন। আমাদের মধ্যেকার কয়েক ইঞ্চি ভূমি থেকে উত্তাপ। উত্তাপ ছড়াচ্ছে এবং গজিয়ে উঠছে নতুন নতুন কাঁচ। আমাদের চারপাশে একটা কাঁচের পৃথিবী। পৃথিবী কাঁচের হয়ে গেল।

কাঁচের দেওয়াল, কাঁচের মণ্ড, কাঁচের ঝোপঝাড়, কাঁচের দেওয়াল, কাঁচের জানলা। আলো, এত আলো ছিল চারদিকে, এতক্ষণ বুঝতে পারিনি। চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। মুখের চামড়ায় আলো আর আলোর তাপ, অনেক আলোর ওম। এই কাঁচের দলা দলা কাঁচের ওপাশে অন্যরা আছে। কঠিন কাঁচের আড়ালে নড়তে থাকা পোকারা। তোমার বাঁদিকে ওই কাঁচের কাঠামোর স্বচ্ছতায় কোনো ঘোলাটে ছায়াপাত হল? কাঁচের দেওয়ালে ঠেসে ধরে বিস্ফারিত চোখ আর নাক আর ঠোঁট — কেউ কি আমাদের দেখছে? সে কী দেখছে? কাঁচের পাত্রে বাতাসের দ্রবণে নড়তে থাকা আমাদের — পোকাদের?

সে কি দেখতে পাচ্ছে তোমায়? তোমার লাল ফ্রক? দেখতে পাচ্ছে তোমার হাঁটুর ভাঁজের কোমলতা? দেখতে পাচ্ছে এই পুতুলের পৃথিবীর জন্য ছড়িয়ে থাকা তোমার যত্ন? দেখতে পাচ্ছে কী ভাবে উত্তাপ জন্মায় তোমাকে আর আমাকে ঘিরে — এত এত উত্তাপ, এত উত্তাপ যে চারপাশের বালি কাঁচ হয়ে যায়, বাড়ি আর দেওয়াল, এমনকি গাছও কাঁচ হয়ে যায়? সে কি দেখতে পাচ্ছে ক্রমে কাঁচ হয়ে যেতে থাকা আমার মাথার দেওয়ালে দেওয়ালে ধাক্কা খাচ্ছে রক্তপ্রবাহ, দপ দপ দপ, কাঁচের মাথায় তাদের প্রবেশ বন্ধ, ধাক্কা মারছে, ধাক্কা মারছে, ধাক্কা খাচ্ছে। যন্ত্রণা, খুব যন্ত্রণা,

বড্ড যন্ত্রণা হয় মাথায়। আমি দু-আঙুল আনি কপালের রগে। সামান্য সামনে-ঝোঁকানো মাথা চেপে ধরি, দুই রগ, কপালের দুই পাশ। আরো আরো আরো চাপ। ধাক্কা খেতে থাকা রক্তপ্রবাহ আমি থামিয়ে দিচ্ছি। থামিয়ে দিচ্ছি, বন্ধ করে দিচ্ছি এই দপ দপ দপ আওয়াজ।

তুমি আর তোমার কাঁচের পৃথিবী থেকে দূরে, আরো দূরে : আমার মাথা ক্রমে শান্ত হয়ে আসে : অবশ ভোঁতা অনুভূতিহীন। চারপাশে অন্ধকার আর আলো, টুকরো টুকরো আলো, তারা নড়ছে, শুধুই সামনে থেকে চলে যাচ্ছে ছুটে যাচ্ছে আমার মাথার পেছনের দিকে।

আরো কাছে, শরীরের খুব কাছে, কিছু রঙ নড়ল, নড়ছে, কিছু কালোর পিণ্ড, আমার চারদিকে শুধু কোলাহল, কথা, নানা কথা, নানা শব্দ, অজস্র গলা, শ্বাস ফেলা, আর ইঞ্জিনের আওয়াজ, গতির তীব্রতা ও দিক-পরিবর্তনের ঝাঁকুনি, আমি কোথায় যাচ্ছি, বুলা? আমি তোমায় দেখতে পাচ্ছি না, শুনতে পাচ্ছি না, কোলাহল, বড্ড কোলাহল আমার চারপাশে বুলা, কোলাহল।

এটা সেই প্রথম টুকরো যা মিহিরের মাথায় গেঁথে গেল। শুধু 'বুলা' নামটাই একটা রহস্য: মিহিরকে পড়িয়ে চলল। যেমন বুলা আজো তাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলে। বুলা, সত্যিই কি বুলা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলে? সেই অনুভূতি যা জন্মায় 'বুলা' শব্দের উচ্চারণে, বুলার সংসর্গে, স্বপ্নে বা বাস্তবে বা কল্পনায়, তাতে বুলার উপস্থিতি কতটুকু? আর কতটুকু সে নিজে?

সেদিন, অফিসটাইমেই, ট্রেনে বসেই অবাক লাগল, ট্রেনে খুব একটা ভিড় ছিলনা, কোনো কারণও খুঁজে পায়নি মিহির ভিড় না-থাকার। ভিড় না-থাকলে যা হয়, একটু স্ফূর্তিসহ হাঁটছিল মিহির। ট্রেন থেকে নেমে রাস্তায় একদম বাঁ-ঘেঁষে হাঁটতে হয় — পিচ করছে, মিউনিসিপালিটির নির্বাচন আসছে সামনে, হঠাৎ ডানদিকের ল্যাম্পপোস্টটা নজরে এল, কতদিন চোখে আসেনি, একটা মজা তৈরি হল মাথায়। সচরাচর একটা ত্রিপল টাঙানো কাপপ্লেটের দোকান, একটা চাটনি আচারের গাড়ি আর কাঠের বাক্সের মত একটা সিগারেটের দোকানে ঘেরা থাকে।

আরো দেখল, ল্যাম্পপোস্টের উঁচুতে লাগানো আড়াআড়ি তারের ডান্ডার গায়ে লটকে-থাকা ঘুড়ির উজ্জ্বল হলুদ কাগজের টুকরো। সঙ্গে একটু কাঠি, আর কাঠির প্রান্তে এককুচি লাল লেজ। ঘুড়ি বেশিরভাগই তো লাল আর হলুদের হয় — কেন? যারা বানায় তারা সব ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টার?

ঘুড়িটা দেখার পরই বুলার কথা মাথায় এল তার। তারপরই একটা ছক ভেসে ওঠে, ছকটা আবিষ্কার করে মিহির। এইখান দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ-উলঙ্গ ল্যাম্পপোস্টটা সে দেখবে, ঘুড়িটা চোখে পড়বে তার, অন্যরকমত্বের একটা মজা, উত্তেজনা, বুলার কথা তার মনে পড়ে যাবে — এর পুরোটাই পূর্বনির্দ্ধারিত, তাই, সেইজন্যেই, অন্যদিনের থেকে তাকে আজ সজীবতর রাখা হল, ট্রেনে ভিড় কমিয়ে।

মধ্যের বড় মাঠটা প্লট প্লট করে বিক্রি হয়ে গেছে। ছোট সরু সরু রাস্তার ব্যবধানে ছোট ছোট প্লটে ভর্তি এখন ছোট ছোট বাড়ি, তাদের ছোট ছোট সংসার। যত ছেলেরা এখানে খেলতে বা খেলা দেখতে আসত, এমনকি মিহিরের ছোটবেলায় হরেকৃষ্ণ কোঙারের মিটিং-এ যত লোক হয়েছিল বোধহয় তার চেয়েও বহুগুণ বেশি মানুষ এখন রোজ রাতে এই মাঠে শুয়ে থাকে, তাদের নিজের নিজের ঘরে, নিজের খাটে।

মাঠটাই আর নেই। ফলতঃ বুলাদের বাড়ি দেখতে পাওয়া, দেখতে দেখতে চলে-যাওয়া, মানে অনেকটা বেশি এগিয়ে বাঁ-দিকের গলিতে ঢোকো, তারপর ঘুরে ফেরত এসো শেষ অব্দি নিজের বাড়িতে। তবু আজকের ভিন্নতর, সজীবতর মিহির হাঁটতে থাকে বুলার বাড়ির দিকে। এমনটা মাঝে-মাঝেই ঘটে — এই ছক আবিষ্কার, তারপর ছক-মোতাবেক হেঁটে চলা বুলার বাড়ির দিকে।

গিয়ে কী হবে তাও জানে মিহির। চোখ সোজা সামনে, কই সে তো কোনো এদিক ওদিক তাকাচ্ছে না, রাস্তা ছাড়া আর কিছুই নেই তার চোখে, মিহির সোজা হেঁটে যাবে রাস্তা বেয়ে। এবং এই হেঁটে যাওয়াকালীন তার চোখের পাশ দিয়ে কত কিছুই তো দৃষ্টিতে চলে আসতে পারত, যেমন আসে ঋজু চোখের ধার দিয়ে তির্যক দৃষ্টিতে। কিন্তু কিছুই আসবে না, কিছুই চোখে পড়বে না তার, বুলাকে তো নয়ই, কাউকেই সে দেখতে পাবে না, কাউকে না, জানে মিহির।

আর, অতিক্রম করে যাওয়ার পরই এতক্ষণ আটকে রাখা দম ফুরিয়ে যাওয়ার একটা একরাস্তা ক্লান্তি।

তবু মিহির না-গিয়ে পারেনা। যেতে তাকে হয়ই, মাঝেমাঝেই।

যেদিন যায়, বাড়ি ফিরে গিয়ে ক্লান্ত থাকে মিহির, এমন দিনের চেয়ে একটু বেশি ক্লান্ত, আবার সঙ্গে একটু করুণ, একটা ঝিম-মারা মন-খারাপ, নিজেই লক্ষ্য করে মিহির। একটু আবেগপ্রবণ থাকে।

ফিরে গিয়ে সেদিন মুড়ি আর চা খাওয়ার আগে, হাত ধুয়ে, হাতটা গামছায় না-মুছে, বৌয়ের আঁচলে মুছতে ইচ্ছে করে। দোরের সামনে লেজ নাড়তে থাকা কালো কুকুরটাকে কটা মুড়ি দেয় মাটিতে। দেখে, সন্ধে হয়ে এল, কচার বেড়ার গায়ে ডানা নাড়ছে রাতশুরুর মথ। এদিন আর দোকানে গিয়ে বসতে, তদারক করতে, দোকানের ছেলেটার সঙ্গে হিশেব মেলাতে ইচ্ছে করেনা তার। মন চায়না।

ফুটবল খেলে, বা অন্য কিছু, মাঠ থেকে ঘরে ফিরে আসে ছেলেটা। বাবাকে বারান্দায় বসে থাকতে দেখে একটু আড়ষ্ট, মায়ের আদেশে মুখহাতপা ধুতে যায় কলতলায়। চেয়ে চেয়ে তাকে দেখে মিহির। আরাম পায়। ছেলেকে বলে দোকানঘর থেকে একটা সিগারেট এনে দিতে — চারমিনার স্পেশাল। সিগারেটের দরকার মিহিরের এই মুহূর্তে কি সত্যিই ছিল — না, ছেলের সঙ্গে একটু কথা বলতে ইচ্ছে করল?

কিছুক্ষণের ভিতরই, বুলার কথা পড়তে পাওয়ার সুযোগেই বোধহয়, ফের গোপালবাবুর ঘরে যাওয়ার বাসনা হয় তার। গিয়ে, ওই ধুলোপড়া এক স্তূপ খাতা নাড়াচাড়া করা। ঘরভর্তি বইগুলো তো সে ধরেই না, দু-একটা উল্টে পাল্টে দেখেছে, কিছু বুঝতে পারেনি।

কিন্তু গোপালবাবু বুলার কথা জানল কী করে? এই বুলা কি ওই বুলাই? নাকি এমন একটা বুলা সবারই থাকে?

মিহিরের ভাবতে ইচ্ছে করে, গোপালবাবু মিহিরের বুলার কথাই লিখে গেছে খাতায়। তার ভাবতে ইচ্ছে করে, গোপালবাবু সব জানত — সব। তার মাথার ভিতর যে ভাবনা ভরা ছিল — সমস্ত। সেই সব জেনে গোপালবাবু আসলে তার চিন্তাকেই লিখে গেছে। তার হয়েই লিখেছে গোপালবাবু। সে নিজে লিখতে পারেনা বলে। এমনটা ভাবতে মিহিরের ইচ্ছে করে।

কিন্তু গোপালবাবু জানল কী করে? জানার এমন ছিলই বা কী? এটুকু ছাড়া যে সে একজন বুলাকে চিনত। প্রায়ই দেখত তাকে। রোজই। পাড়ার পুজোয় খুব কাছ থেকে দেখেছে। দুটো চারটে কথাও বলেছে। একবার দোলের দিন, অন্য প্রচুর আরো অনেকের সঙ্গে মিলে, দোলের দিন যেমন হয়, তার কপালে মাথায় গালে আবিরও দিয়েছিল মিহির। রঙ, নানা রঙ, মুখ গাল, তার ভিতর নড়ছে উজ্জ্বল কালো চোখের মণি। মিহির মনে করতে পারে। সত্যিই পারে? নাকি, এটা শোলের ফ্ল্যাশব্যাক, জয়া ভাদুড়ি, টাঙার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়চ্ছে, ঘাগরা আর ফাগ আর পিচকারি, উচ্ছলতাটাকে পরে সে বুলার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছে? দু-একবার, সুযোগ প্রায়সুযোগ খণ্ডসুযোগ পাওয়া মাত্রই কথা বলার চেষ্টা করেছে মিহির, বেশিরভাগ বারই পেরে ওঠেনি। কত সুযোগ এভাবে হারিয়ে গেছে। প্রত্যেকটা হারিয়ে যাওয়া সুযোগকে স্পষ্ট মনে করতে পারে মিহির — সত্যি, সে যদি আর একটু সাহসী হত, আর একটু আত্মবিশ্বাসী।

তারপর, বুলার একসময় বিয়ে হয়ে গেল। বুলার বিয়ের দিন মাইকে সানাই বাজছিল — কিছুতেই, অনেক রাত হয়ে যাওয়ার আগে অব্দি, মিহির বাড়ি ফিরতে পারছিলনা। ফিরল যখন, মাইক নিস্তব্ধ। আর কিছু বাজছে না। তখনো অব্দি টিকে থাকা বড় মাঠটার পাশে নালার ধার ঘেঁষে ঢেলে দেওয়া কলাপাতা আর নষ্ট খাবারের স্তূপে চিৎকার আর খোঁজাখুঁজি করছে কয়েকটা ভিখিরি আর কুকুর। বিয়ের গেটে লাগানো তখনো জ্বলে-থাকা বড় আলো চকচক করছে সেই কুকুর ও ভিখিরিদের শরীরে।

গোপালবাবুর লেখা পড়ে, প্রায় যে কোনো লেখাই, কেমন একটা গুলিয়ে যায় মিহিরের, তবু লেখাটা পড়তে তার ভালো লাগে কেন? 'বুলা' নামটার জন্যে? নাকি, বুঝতে পারল কি পারল-না এই অস্পষ্টতাটা একটা মজা তৈরি করে? এমনকি, যখন একটুও বুঝতে পারেনা, তখনো পড়ে চলে মিহির, ভালো লাগে তার। তার মনে হয়, গোপালবাবুর এই লেখা, বছরের পর বছর স্তূপাকৃতি খাতা ভরে লিখে চলা, তারপর একদিন হঠাৎ বন্ধ ঘর ফেলে, কাউকে কিছু না-বলে উধাও হয়ে যাওয়াটা শুধু মিহির এসে পড়বে, লেখাগুলোকে আবিষ্কার করবে বলেই।

নইলে, বুলা নামটা কী করে আসে?

মিহিরের মাথায় এল, লেখাটার শেষদিকে ওই মাথার যন্ত্রণার কথা। গোপালবাবুর কি খুব মাথার যন্ত্রণা করত? গোপালবাবুর ঘরে এখন-ধুলোঢাকা সামনের তাকে ওই যে সারি সারি ওষুধের শিশি — ওগুলো কি সেই মাথার যন্ত্রণার জন্যেই?

খুব মাথার যন্ত্রণা করত গোপালবাবুর? কেন? মাথায় কিছু হচ্ছিল? নিজের মনে মনে উচ্চারণ করে উঠতেও খারাপ লাগে মিহিরের, তবু, না-ভেবে পারেনা, গোপালবাবু কি পাগল হয়ে যাচ্ছিল? লেখাটা পড়েও এই কথাটাই মনে হয়। এই খাতাগুলোর থেকে আরো অনেক লেখা পড়েই এমনটা মনে হয় মিহিরের। লেখাগুলো পড়তে পড়তে নিজের ভিতরটাও কেমন পাগল-পাগল লাগে। কিছু বুঝতে পারছেনা বলেই ওরকম লাগে তার? কিছুই বুঝতে পারেনা তো লেখাগুলো পড়তে তার ইচ্ছে করে কেন? লেখাগুলোর কাছে বারবার ফিরে আসার সাধ যায় কেন? — গোপালবাবুর এই ঘরে বসে থাকার সাধ, বছরের পর বছর যে ঘর শুধু বন্ধই দেখেছে। শুধু রোজ গোপালবাবু ঢোকার আর বেরোনোর সময় দরজাটা একবার করে খুলেছে আর বন্ধ হয়েছে।

গোপালবাবুর পাগলামি সংক্রান্ত এই ভয়-ভয় চিন্তাটা মিহিরের মাথায় ছিলই, এমন অবস্থায় খাতা হাঁটকাতে হাঁটকাতে তারিখ না-দেওয়া এই লেখাটা খুঁজে পেল।

> তোমায় লিখি আমি। লিখে চলি তোমাকে। তুমি আমার প্রতিটি অক্ষর। আমার অক্ষর আর অক্ষর জুড়ে উল্লাস। তোমাকে লিখে তোলার উল্লাস। আগে কি আমি বেদনা বলে ভাবতাম? বেদনা আর নিঃসঙ্গতা : লিখে চলা?
>
> এখন আমি উল্লাস লিখি। এখন তোমায় লিখি। একটা একটা করে অক্ষর বসাই কাগজে, তুমি প্রাণ পাও, তোমার মুখ নখ চোখ প্রাণ উরু, আমি তোমায় লিখে চলেছি। লেখার মধ্যে, তোমার মধ্যেই থাকি আজকাল।
>
> আজ ভোরে, আলো তখনো বুদ্ধি দিয়ে বুঝছি, তোমাকে পেলাম : কিছু অক্ষর শব্দ আর বাক্য। বুলা, তুমি ঝকঝকে নিরাবরণ ঝলসিয়ে উঠলে সেই অক্ষরের সমারোহে।

কবে, সেই ছোটবেলায়, প্রথমবার দেখলাম, 'হাসি' শব্দটা লিখেই, 'হ'-এ 'আ'-কার দেওয়া মাত্রই একটা হাসির ক্রিয়া শুরু হয়ে গেল : একটা আরাম, গলে চুঁইয়ে পড়ে তোমার মুখের পেশি থেকে, তুমি হাসছ : হাসছ : আরাম। আমায় মিশে যেতে দাও তোমার মুখের চামড়ায়, তোমার টোল-পড়া গালে, গজদাঁত-লুকোনো তোমার ঠোঁটে, তোমার চিবুকে : আমায় মিশে যেতে দাও।

আমি তোমার শরীরে মিশে যাচ্ছি। তোমার ভোর-কোমল বিছানার উষ্ণতায় স্বাদ মুখের চামড়ায় আমি নাক ঠেকাচ্ছি, আমার হাত, আমার সমস্ত শরীরটা, গোটা শরীরটা কুলিয়ে গেল, ছোট হয়ে এসে মিশে যাচ্ছে তোমার মুখে। আমি তোমার মধ্যে মিশে আছি।

তুমি কোথায় পালাবে? এখন আমি তোমায় গোপন করে ফেলেছি। আমি মানেই তুমি। প্রচার করে দিলাম, তুমি আর নেই। সমস্ত রেডিও স্টেশন থেকে আজ ভোরে একসঙ্গে ঘোষণা হল তোমার মৃত্যুসংবাদ। আমি কাউকে আসল কথা জানতে দিইনি।

এখন তুমি শুধু আমার সঙ্গে। তুমি শ্বাস ফেলো শুধু আমার অক্ষরে। আমার অক্ষরই তুমি। যেই আমি পেন নিয়ে বসি, তুমি আকার পাও। আমার এই বন্ধ ঘরের ভিতর একা, আমার কাগজে, আমার পেনের দাগে, তুমি আর আমি : একা। কখনো তোমার চুলের রাশ থেকে কুয়াসা জন্মায়, আমি হাতড়াই, কখনো তোমার বুকের ওঠানামায় আমি হাঁটি, হাঁটি, হাঁটতেই থাকি, তোমার সঙ্গে থাকি।

তোমাকে না-পাওয়া আর নেই আমার। আমার কোনো বেদনা নেই। আমার কোনো নিঃসঙ্গতা নেই। শুধু উল্লাস এবং উল্লাস।

তোমার কাছে পৌঁছতে না-পেয়ে যখন আমার সমস্ত আকাশ বর্ণহীন হয়ে যাচ্ছে, সমস্ত দেওয়াল অনন্ত, শুধু সাদা কাগজ, মৃত বর্ণহীন অশেষ, আমি তোমায় গড়ে তুলতে থাকি। অক্ষর আর অক্ষর আর অক্ষর।

আমি পাগল হইনি, বুলা। আমি পাগল হইনা।

আমার এই আবিষ্কারের পর পৃথিবী বদলে গেল। পাগলামি এখন থেকে শুধু এক যাত্রা, একটা অনুষ্ঠান মাত্র। একটা অনুষ্ঠান, বুলা, একটা রিচুয়াল। তোমাকে কাছে পাওয়ার রিচুয়াল। তোমার হাত পা মুখ গলা নাভি হাঁটু পেট সব কিছু একত্রে চেটে চুষে তোমাকে আমার জিভে, আমার রক্তে মিশিয়ে ফেলার একটা রিচুয়াল।

এই ঘর থেকে আমি বেরোই বুলা, রোজই বেরোতে হয়। আবার ফিরে আসি আমার কাগজে। তোমার কাছে। তোমার সঙ্গে আমার রিচুয়ালে।

পড়ে, আর মিহিরের মনে হয়, এ তো তারই কথা। সে, মিহিরও, তো এই ভাবেই ফিরে ফিরে আসে এই ঘরে। কেন আসে? বুলাকে পাবে বলে?

মিহিরের এরকমও মনে হয় মাঝে মাঝে, সে আর গোপালবাবু কি আলাদা লোক — না, আসলে তারা একই লোক? সে ছাড়া আর কার পক্ষে সম্ভব এভাবে বুলাকে নিয়ে লেখা? ভাবে মিহির — এমনটা কি সম্ভব? — যে সে নিজেই এই এত বছর ধরে গোপালবাবু সেজে আলাদা একটা জীবন যাপন করে চলেছে, নিজেরই বাড়িতে পেইং গেস্ট হয়ে? এরকম ভাবে যখন তখনি মনে হয়, মাথার মধ্যে ছবি ভেসে উঠছে, আবছা ধোঁয়াটে ঘষাকাঁচ ছবি — ছবির স্রোত, ছবিতে সে নিজেকেই দেখতে পায়, নিজেকেই, সে লিখছে, সে-ই গোপালবাবু, লিখেই চলেছে, খাতার পর খাতা।

না, তা-ই বা কী করে সম্ভব? তার স্পষ্ট স্মৃতি আছে, গোপালবাবু বারান্দার টুলে টেবিলে বসে খাচ্ছে, কিম্বা পায়খানা থেকে বেরিয়ে ইঁটের মাথায় রাখল ক্যাপস্টান প্লেনের প্যাকেট আর দেশলাই। নিজেকে সে নিজে কী করে দেখবে? সেটা একমাত্র সম্ভব আয়নায়। আর আয়নায় মানুষ তা-ই দেখে নিজে যা করছে। দুজনে মিলে তো আর একইসঙ্গে একটাই পায়খানা থেকে বেরোনো যায়না।

আর ওই লেখা সে কী করে লিখবে? সে ভালো মানেই বোঝেনা। ইংরিজি শব্দগুলো ছেড়েই দাও, অন্যসব? কিছু বোঝেনা, কিচ্ছু না, তবু কিছু বোঝে। একটা ধাক্কা, একটা গতি, একটা এলোমেলোপনা। এই ধাক্কায় সে কি নিজেও এলোমেলো হয়ে পড়ছে? সে কি নিজেই পাগল হয়ে যাচ্ছে? এমন সব অনেক কিছু ঘটছে আজকাল যা সে আগে কল্পনাই করতে পারত না। অথচ সে নিজেই ঘটাচ্ছে। সেদিন যেমন হল, একটা ওরকম বিদঘুটে অংশ খুঁজে পেল গোপালবাবুর খাতায়। সেটা পড়ল। তারপর, তার পরপরই, নিজেই ঘটাল, মিহির নিজেই, কেউ এখনো জানেনা, কিন্তু সে নিজে তো জানে। তার ভয় হয়।

তার ভয় হয়, গোপালবাবুর এই লেখাগুলো পড়তে পড়তে সে কি বদলে যাচ্ছে, অন্য মানুষ হয়ে যাচ্ছে, পাগল হয়ে যাচ্ছে?

গোপালবাবুর এই লেখাটা পরপর চারটে পাতা জুড়ে। বাঁদিকটা সাদা, যেমন সচরাচর হয়, এই খাতাগুলোয়। একদম কাটাকুটি নেই এই লেখাটাতে। কিন্তু অক্ষরগুলো দেখলেই বোঝা যাচ্ছে, ভয়ানক তাড়াতাড়ি লেখা।

খোলা জায়গায়, মুক্তি মানেই উল্লাস, তুমি লাফ দিয়ে উঠেছিলে। সামনে বিস্তৃত সবুজ, সাদা কাশফুল, অনেক দূরে দূরে ভাসছে দু-একটা বাড়ি, উঁচু।

মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে বাড়িগুলো সত্যিই বাড়ি, ঘুড়ির মত টাঙিয়ে দেওয়া কাগজের বাড়ি নয়।

অনেকক্ষণ অনেকক্ষণ হাঁটার পর মুখ তুলে তাকাচ্ছি, তোমার বুকের থেকে মুখ তুলে দিগন্তের দিকে তাকালাম, তখনই বোঝা গেল, বাড়িগুলো হাওয়ায় ভেসে ভেসে ভেসে দূরে দূরে চলে গেছে। দূরেরটা কাছে, কাছেরটা দূরে, দূরেরটা আরো দূরে, আরো কাছে, এলোমেলো নড়ে বেড়াচ্ছে : ভাসমান। তাকালেই স্থির, যেন ধ্রুবতারা।

জমির পর জমির প্লট, আরো প্লট, প্লট প্লট সবুজ। কোনো কোনো প্লটে বাড়ি ভাসানো হয়ে গেছে। বাড়িসমৃদ্ধ বড়লোকেরা তাদের মহিলাদের সঙ্গে ভেসে বেড়াবে, ভাসতে ভাসতে এ অন্যের থেকে দূরে চলে যাবে, যতক্ষণ না এত ভারহীন হতে পারে যে দূর নক্ষত্রমণ্ডলে ভেসে যাবে মাধ্যাকর্ষণহীন। বাড়ির বারান্দায় ভাসতে ভাসতে মেয়েদের একসময় রঙ বদলে যায়, পেট ফুলে গেছে, পরে একদিন বাচ্চা হয়েছিল। বাচ্চারাও ভাসে আর ওড়ে। ভাসমান মানুষদের কোনো মলমূত্র হয়না, দেবতাদের অনেক কাছে থাকে বলে। দেবতাদের কথা যদি নাও মানো, আকাশে থাকা মানে উচ্চতার মহাজাগতিকতায় থাকা : একথা তো মানো।

উল্লসিত ঘাসের আশ্রয়ের ভিতর খুব সামান্য নড়তে নড়তে আমি তোমার সালওয়ারের উপর দিয়ে, তারপর একসময় কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে, আরো পরে কুর্তা আর সালওয়ারের নিচে আঙুল বোলাচ্ছিলাম। হাতসহ আঙুল। হাতটা লেগে থাকায় আঙুলের গতি কিছুতেই মসৃণ আর বৈদ্যুতিক হচ্ছিলনা।

সালওয়ারের গিঁট খুলে তোমার যোনি দেখলাম। আমার যোনি থেকে তোমারটা আলাদা, তোমারটায় একটা ছিদ্র, আমি দেখি। মাংসের ঢেউ, প্রবহমানতা।

তুমি তোমার মাথা নাড়াচ্ছ। হয়ত ঘাড়ের সঙ্গে একটা বিচ্ছিরি কোণে আটকে থাকাটা এড়াতেই। চোখ বুঁজেছিলে কেন বুলা? আমাকে দেখতে চাওনি? নাকি, তোমার দৃষ্টি চলে-যাওয়াকে আটকে রাখতে? তুমি এত ভিতু!

তোমার কুর্তা তুলে দিলাম, তোমার ব্রা-এর দুটো পাঁপড়ির ঠিক মধ্যস্থলে একটা গোলাপি কুঁড়ি। সাদা ব্রা-এর উপর আঙুল বোলাতে বোলাতে আমার আঙুলের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছিল। কত, কত আঙুল। আমি গুনিনি। জলের ভিতর সাতারমান মৎস্যকন্যার চুলের মত আমার আঙুল, আমি তোমার বুকের উপর নুয়ে পড়ি। তোমার ব্রা-টা একসময় ফেটে গেল। বেরিয়ে পড়ল বুকদুটো। ঠিক দুটোই ছিল, আমি এখনো আমার মাথার ছবির থেকে গুনে নিতে পারছি।

আমি তোমার শরীরের উপর নড়ে বেড়াচ্ছি। এই আমি আমার ঠোঁটটাকে গড়িয়ে দিলাম। গড়িয়ে যাচ্ছে, গড়িয়ে যাচ্ছে, অন্তহীন গড়াচ্ছে। আমার মাথা ঢোকালাম তোমার শরীরে, ডানদিকের পাঁজরের নিচে গহ্বরে। ডানদিকে হৃদপিণ্ড না-থাকায় একটা অনাবিল শূন্যতা। তোমার শরীরের ভিতরটা কি শূন্য : আশ্রয়, তবু আমার মাথা বার করে আনতে হল, আমার শরীরটা বাইরে রয়ে গেছে।

আবার তোমার শরীরের বাইরে, তোমার কুর্তায় সালওয়ারে তোমার গতকালে তোমার নিশ্বাসে তোমার চিৎকারে তোমার অক্ষরে অক্ষরে আমি স্পর্শ করি, তোমায় মহিমান্বিত করে তুলি, তোমার শরীর থেকে গন্ধ বেরোয়, ফিরোমোন, তুমি তোমার নিজের প্রতিবিম্ব হয়ে যেতে থাকো, শুধু তোমার ডানদিকটা এখন থেকে বাঁদিক বলে প্রচারিত হবে।

তোমার শরীরের কাছেই ঘাসে একটা বিছেকে দেখলাম। প্রথমে স্ফটিকের, কাঁচের বলে মনে হল : এত জীবন্ত। হাঁটতে হাঁটতে বিছেটা গজিয়ে-উঠতে-থাকা বিজন সল্টলেকের একটা নির্মীয়মান আয়ল্যান্ডের দিকে চলে গেল।

এই সময়েই মুখে সেই অনুভূতি, জিভের উপরে, একটা অতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলল কেউ আমার জিভের উপর, কোনো কথা বলল, গভীররাতে আকাশকে জাগিয়ে দেওয়ার ভয়ে কেউ টেলিফোনে কথা বলল।

মুখের ভিতরে জিভটাকে নড়ে উঠতে, কেঁপে যেতে দেখলাম, ভয় পেয়েছিল, কুঁকড়ে কুঁকড়ে আসতে দেখলাম।

মুখ সরালাম তোমার বুক থেকে, বুকের বোঁটা থেকে, আমার জিভ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল বিছে। সেই বিছেটাই কিনা, আমি আয়ল্যান্ডের দিকে তাকিয়ে খুঁজলাম। দেখতে পাচ্ছিনা। শুধু আলো। আমি আলো ছাড়া কিছুই দেখতে পাইনি। বিছেটা ততক্ষণে হয়ত অনন্তে চলে গেছে।

অনন্তে যাওয়া ভালো, আর কেউ খুঁজে পায়না, ফিরে না-এলে।

বিছেটা আমার জিভ থেকে তোমার বুকে, ঘাসে চলে গেল, কোনো আড়ালে। তোমার বুক দেখছি, জমাট বাঁধা নিশ্বাস, কত দিন ধরে তুমি শ্বাস নিয়েছ, বায়বীয় শ্বাস জমাট বেঁধে বেঁধে তোমার বুক, আমি দেখছি, তোমার বুক থেকে তুমি আমাকেও শ্বাস দিতে পারো কিনা, সেই পরীক্ষা করছিলাম।

আমার কামড়ে ক্র্যাকড তোমার নিপলের ফাটল থেকে একটা বিছে বেরিয়ে এল, তুমি কেঁপে উঠলে, অরগাজম এক, কত লোম বিছের শরীরে, পাগুলো নড়ছে ঘাসের দিকে। আর একটা। আরো একটা। অরগাজমের পর অরগাজম। তুমি শান্ত তৃপ্ত। সল্টলেক বিছেতে ভরে গেছে।

লেখাটা এখানেই শেষ। পাতার নিচে কিছুটা সাদা জায়গা। অনেকগুলো বেমানানতা মিহিরের মাথায় খচখচ করে। সালওয়ার কুর্তা। সল্টলেক কোথা থেকে এল? এইসব। কিন্তু, তার চেয়েও বড় — একটা ভয় — মিহিরের গা কেমন শিরশির করছে।

বাঁদিকের জানলার খোলা পাটার দিকে তাকাল। মিহির ঘরে এসে জানলাটা খুলে দিয়েছিল।

এখন রাত। বাইরে ঝুঁকে থাকা আমগাছের ডালে অন্ধকার কালো পাতায় অন্ধকারের ওঠানামা, মোড়ের ল্যাম্পপোস্টের আলোর অবশেষ। তারও পিছনে টুকরোটাকরা ঘননীল, রাতের আকাশ।

ভয়, আর গা-শিরশিরানি। ভয়টাকে কি ভালো লাগল মিহিরের? তাই কি সামান্য ঘাড় আর কাঁধ বেঁকিয়ে ময়লা, পুরোনো, চুনকামের চিহ্নে ভর্তি সুইচবোর্ডে গোল সাদাকালো নড়বড়ে সুইচের ঢিলে ডান্ডাটা নাড়িয়ে নাড়িয়ে কিয়দ্দীর্ঘ চেষ্টায় আলোটা নেভাল মিহির?

এখন অন্ধকার। কোনো আলো নেই যে আক্রমণ করে। বাইরে রাত, ঝাঁকড়া আমপাতার অন্ধকার।

এই আলো আঁধারি অন্ধকার, কোনো তীব্র তীক্ষ্ণ আলোর বাইরে — এখানেই আরাম। নিজের শরীর আর নিজের না, নিজের মনও না, শরীরের ভিতরে বাইরে আকাশকে অনুভব করা যায়, আকাশ আর হাওয়া, আর কত উপস্থিতি।

এই ঘর বাবা দাঁড়িয়ে থেকে বানিয়েছিল। তার পর অবশ্য কত বদলেছে। আদত ঘরের সেই পুরোনো বেড়ার টুকরো আজো আছে বৌয়ের লক্ষ্মীর সিংহাসনের নিচে। সেই বাবা এখন কোথায়? মরে গেল, মরে কোথায় গেল, একটুও নেই আর? এখন এই ঘরে?

মমতা গত কবছর পুজোতেও আসেনি, মা মারা যাওয়ার পর থেকে, বৌয়ের সঙ্গে বনেনা ওর। ননদ-জায়ে অমন তো ঘটেই। মমতা কেমন আছে? কত দূরে, সেই কোচবিহারে, কোনোদিন ওদিকে যায়নি মিহির। কোথায়-ই বা গেছে? সেই মমতাও কি নেই এখন এই ঘরে?

এই ঘর তখন বানানো হচ্ছে, মিস্ত্রিরা দুরমুশ পেটাচ্ছে ইঁটের টুকরো ফেলা মাটিতে, ইস্কুল থেকে ফেরা মাত্রই মমতা তাকে লুকিয়ে ডাকল, এদিকে ডেকে এনেই দেখাল দুটো সিগারেট — চার্মিনার, একটা প্যাকেটে। রাস্তায়, ঠিক বাড়ির সামনেই, কুড়িয়ে পেয়ে রেখে দিয়েছে। ঠিক এখন যেখানটায় বসে মিহির, সেইখানটাতেই কি দাঁড়িয়ে ছিল মমতা?

মিহির কি হাত বাড়াবে? বাড়ালেই কি ছুঁতে পারে মমতাকে? মমতা কি এই মুহূর্তেই ডেকে এনে তাকে হাতে করে দিচ্ছেনা সিগারেটের প্যাকেট? সেই মমতা কোথায় গেল? এখানেই আছে, ঠিক এইখানটাতেই, জানে মিহির। হাত বাড়ালেই ওর চুলে ঘাড়ে হাত রাখতে পারে, ওর চুলে বাঁধা লাল সিল্কের ফিতেয়, কত দিন টেনে গিঁটসহ খুলে দিত মিহির, এখন আর দেয়না?

শুধু বাবা না, শুধু মমতা না, আরো কত, কত মানুষ, মিহির চেনে তাদের, মিহির চেনেনা : তার চারপাশে ভিড় করে ঘিরে আসে তাকে। তার শরীরের ভিতরে বাইরে ঢুকে স্রোতের মধ্যে মিশে থাকে, সময়ের স্রোত, মানুষের স্রোত, অনুপস্থিত মানুষের স্রোতে।

ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়ার অনুভূতির ভিতর হাত তুলে নিজের বুকে রাখল। সুতির জামার কলারের কাছটা ধরে দুটো দিককে টেনে বুকটা ঢাকে। দেওয়ালে পিঠ দিয়ে বসে থাকে। চোখের পাতা সামান্য নেমে আসে, ঢিলে, মাঝামাঝি অব্দি।

আধবন্ধ চোখের ভিতর অন্ধকার আর খোলা জানলা আর বাইরের রাত।

এই ঘরটাই ছিলনা এক সময়, এই বাড়িটাই ছিলনা। তার আগে কি মাঠ ছিল? তারো আগে, জঙ্গল? তারো আগে অনেক আগে? রাজাদের, সম্রাটদের সময়? তখন কি ছিল আদৌ এই জায়গাটা, ছেলের ভূগোল বইতে যেমন লেখা, গোটা নিম্নবঙ্গটাই এক সময় সমুদ্র ছিল, চর পড়ে পড়ে তৈরি হয়েছে?

এই সমস্ত, শ-শ হাজার বছর ধরে এই জমিটুকুর উপর দিয়ে কত মানুষ হেঁটে গেছে, কত লোক এসে দাঁড়িয়েছে, তাদের সবাইকেই কি এখন মিহির তার চারপাশে পায়?

এই জমিতে কখনো কারো ভিটে ছিল। সে সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরে আসত। তার বৌ সন্ধেবেলায় তুলসীতলায় আলো দিত। মাকে যেমন দেখেছে ছোটবেলায়। তারপর, তারা কোথায় গেল? তাদের ভিটে কী হল? ভেঙে গেল, মিলিয়ে গেল, জঙ্গল হয়ে গেল, একসময় মিহির যেমন যাবে? কোনো কিছুর আর কোনো মানে রইলনা। লোকটা হয়ত, হয়ত কেন নিশ্চয়ই, তার বৌকে, সন্তানকে খুব ভালোবাসত, কত দুঃখ পেয়েছিল, কত চোখের জল, কত হাসি, সে সবের কোনো মানে নেই, কোনো মানে রইলনা, তা কি কখনো হতে পারে?

তাদের সবাইকে কি এখন টের পায় মিহির, তার চারপাশে আধখোলা চোখের সামনে খুব ঘন কালচে নীল অন্ধকারে? তারা কি চাইছে, মিহির এখন এখানেই থাকুক, এই ঘরে, এই ভাবে বসে থাকুক আর তাদের অনুভব করুক? কী হবে অনুভব করে? একটা উচ্ছ্বাস নিজের মধ্যে টের পায় মিহির। কেন উচ্ছ্বাস তা বুঝতে পারেনা। মিহির টের পায় তার চোখে জল আসছে। কেন? ভয় পেয়ে, না দুঃখ? কিসের দুঃখ? জানেনা।

ঠান্ডার অনুভূতিটা একটু বাড়ে। পরনের লুঙ্গিটাকে ডান পায়ের আঙুলে ধরে মেলে দেওয়া বাঁ পায়ের মাথায় আটকে নেয়। পা দুটো ঢেকে নেওয়ার চেষ্টা করে।

মিহির খাটের কিনারের খাঁজে আঙুল বোলায়। বাঁ হাতটা বুকের উপর। এই খাটটা কাঠের, ফাটল ধরেছে, একদিন আর থাকবেনা, ঠিক যারা বসেছে খাটের উপর তাদেরই মত। যারা এই কাঠের গাছটাকে জন্মাতে দেখেছিল, তারা যেমন আর এই পৃথিবীতে নেই। কী মানে হল এই পুরোটার? বেঁচে থাকার আর মরে যাওয়ার? কেন বাঁচে মানুষ? ছোটবেলায় তো কত স্বপ্ন দেখত সে, কত জায়গায় যাওয়ার, কত কিছুর। সেই সব কী হল?

হঠাৎ বৌয়ের কথা মাথায় আসে মিহিরের। বৌয়ের, বাচ্চাদের। ওরা ঘুমোচ্ছে, ঘুমের বিছানায়। অঘোরে ঘুমোচ্ছে ওরা এখন, এই গভীর রাতে।

গত শনিবার, শনিবার তো বোধহয় এমনিতেই পাঁচটার পর থেকে ট্রেন ক্রমে ফাঁকা হয়ে আসে, আরো সেদিন দশটা বারোর লোকাল, জানলার পাশেই, কম্পার্টমেন্টের কোনার দিকের সিটে বসেছিল মিহির। চোখের সামনে নানা লোক, ফেরিওয়ালা,

হলদেটে আলো, ট্রেনে যেমন হয়, কেউ ডাকল, 'মাসি, এখানে এসো', বা, কেউ বিড়ি ধরাল, বিড়ির গন্ধে একটা কড়া মাদকতা, একজন দুজন তিনজন বৃদ্ধ প্রৌঢ় মাঝবয়েসি ঝিমোচ্ছে জীবনযাপনের ক্লান্তিতে : এই সবই কি সে দেখছিল — চোখের সামনে গতিময় ট্রেনজীবন?

সামনের সিটে ঘুমন্ত বছর কুড়ির ছেলেটা, আগেই দেখেছে মিহির, খোলা জানলার হু হু ফেব্রুয়ারি-বাতাসে ঘুমোচ্ছে, অঘোরে, ক্লান্তির আরামে, তেল মাখা কালো চুল হাওয়ার ধুলো মেখে মেখে মাথায় সেঁটে এসেছে, এখন শুধু ডগাটুকু কাঁপে। দেখছিল মিহির, আবার ভুলে যাচ্ছিল।

ছেলেটা হঠাৎ ধড়ফড় করে জেগে উঠল, 'আমার চটি কই — ?' বোকার মত তাকিয়ে রইল এদিক সেদিক, সদ্যনিদ্রোত্থিত।

মিহির দেখেছিল, ছেলেটার মুখ ক্রমে ফ্যাকাশে হয়ে যায়, চোখ দৃষ্টিশূন্য। দেখেছিল না ভেবে নেয়, ভেবে নিতে পারে সহজেই?

মণিশূন্য সাদা চোখ মিহিরের দিকে শ্লথ ফেরাল ছেলেটা, 'আজ — আজকেই কিনেছি—লাম।' চটিটা 'কিনেছি' থেকে 'কিনেছিলাম' হয়ে যাওয়ার এলোমেলোপনা তার ছাপ ফেলে 'লাম' উচ্চারণের অস্পষ্টতায়।

বাড়ি ফিরেও মিহিরের কি একটু দম-আটকে আসছিল? নিজের ঘুমন্ত ছোটছেলের ঘুমোলেই ঘামতে-থাকা ভিজে কপালে সেঁটে যাওয়া লোম লোম চুলে আঙুল বুলিয়ে নিজের শ্বাসক্রিয়াকে সে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে?

এরকম তো রোজই। অবাঙালি নারী হলুদ শাড়ি দেহাতি রোগা তার কাঁচের চুড়ির হাত নেড়ে শাড়ির খুঁট খুলে দেখল, যাওয়ার পথে কন্ডাক্টর তাকে যে দুটাকার আর একটাকার নোটটা দিয়েছে, তার কোনোটাই চলবেনা, আর তাই, দূর থেকে বাদামওয়ালাকে দেখেই ছেলেকে বাইরের ল্যাম্পপোস্ট বা বিশ্বরূপ দেখায়, পাছে বাদাম খেতে চায়, সকাল থেকে খায়নি কিছু।

কাউকে না কাউকে এরকম দেখে মিহির, আর সেই ভার বহন করে পেটে ফুসফুসে। মিহির শুধু বহন করে আর বহন করে — আর কীই বা সে করতে পারে?

ছোট ছেলের কপালে আঙুল বোলায়, চোখ বুজে আসে মিহিরের। গোপালবাবু কাঁচের ভিতর আটকে যাওয়া পোকার কথা লিখেছিল না? কাঁচ না মোম? সলতের পাশে পাশে গলা মোমের পুষ্করিণীতে পড়ে শামাপোকা হাত-ছোঁড়া পা-ছোঁড়া শরীর মন অস্তিত্ব জুড়ে প্রচুর ধাক্কা আর আন্দোলনের শেষ মুহূর্তগুলোয় কী ভেবেছিল? তার কি দম-আটকে এসেছিল?

দম-আটকে আসার, হাত-পা-ছোঁড়ার, গলন্ত মোমের নিয়তির কোনো শেষ তো কোথাও থাকবে? সুতির নরম জামা উঠে যাওয়া ছেলের বর্তুল পেটে গাল ঠেকায় মিহির, চোখ সজোরে বন্ধ। কোথায়, ভগবান, কোথায়? বৌ ডাকে, 'খেতে এসো, দিয়েছি'।

এখন, এই রাতের আকাশে কালচে রক্ত মেশা ঘন নীল আর পাতায় পাতায় স্তূপ অন্ধকার, মিহিরের বাঁ হাতের নিচে, জামার নিচে, বুক ওঠানামা করে, ওঠে, নামে, ওঠে, নামে, ওঠে।

গোপালবাবুর, এই শালার গোপালবাবুর লেখার জন্যেই কি তার হচ্ছে এই রকম? ও ঘরে ওদের কাছে যাই, এরকম ভাবে মিহির।

গিয়ে কী হবে? তবু, তবু যাই। গিয়ে কিছু হবেনা, কিছু হয়না, কোথাও যাওয়া যায়না, শুধু হেঁটে বেড়ানো। রাতের বিছানার কথা, বাচ্চাদের কথা, বৌয়ের শরীরের কাহিনী মাথায় আসে মিহিরের। গোপালবাবুর ঘর থেকে বেরোয়। তালা বন্ধ করে।

এ ঘরের হাওয়ায় দেওয়ালে একটা হালকা আলো, আসলে ল্যাম্পপোস্টের আলোটা অনেকটা কাছে, আর দু-পাশের জানলা দিয়েই আলো ঢোকে। যেন একটা নাইটল্যাম্প : যদি না শীতে বা বর্ষায় জানলা বন্ধ থাকে।

মশারির মধ্যেটা আবার অদৃশ্যপ্রায়, ময়লা বলে নয়, বৌ প্রায়ই কাচে, কালচে হয়ে এসেছে মশারিটা, মলিন আর জীর্ণ, বয়সে বয়সে, এবার বদলাতে হবে, বৌ সেলাই করে চালাচ্ছে। তাও, অভ্যস্ততায় মিহির বুঝে নিতে পারে, দেওয়ালের একদম ধার ঘেঁষে সাতবয়স্ক বড়ছেলে, তারপর ছোটছেলে, তার এপাশে বৌ। বৌয়ের শরীরটা যথাসম্ভব সঙ্কুচিত, মিহিরের শোয়ার জায়গার যাতে অভাব না-হয়।

যত্নে গোঁজা মশারির ধারটা তোলে মিহির, ঢুকতে ইচ্ছে করে তার — সত্যিই কি তার ইচ্ছে করছে? — ছটফটে লাগে মিহিরের। গোপালবাবুর লেখায় এই সালওয়ার কুর্তা মেয়েটার শরীর তাকে উত্তেজিত করেছিল, আর তার পর পরই ছবির পর ছবি, গোপালবাবু কেন লিখেছে ওই সব? গা-এর মধ্যে শিরশির করছিল, তবু পড়েই চলে মিহির, পড়েই চলে, পড়ে চলাটা নিজের কাছেই, সেই মুহূর্তেই, একটা পাগলামি বলে বোধ হতে থাকে। গোপালবাবুর এই লেখাগুলো — এগুলোর মানে কী? কেন লিখেছে? কেন তার পড়তে ইচ্ছে করে? নিজেকে আদ্যোপান্ত ভুলে যেতে পারার বাসনা, মিহির মশারির ধার তোলে তাড়িত হাতে।

মশারির মধ্যে ঢুকেই একটু থমকে যায় মিহির। তিনজনের ঘুমগভীর নিশ্বাসপ্রশ্বাস। বাচ্চাটার শ্বাস একটু অনিয়মিত। নাকে একটা একটানা শব্দ। বড্ড সর্দিতে ভোগে।

তিনজনের শ্বাসের মিলিত শব্দ মিহিরকে একটা আরাম দেয় : বেঁচে আছে ওরা : সে কি এতক্ষণ ওদের মরে যাওয়ার ভয় পাচ্ছিল?

বৌয়ের দিকে তাকায় মিহির। মুখটা দেখা যাচ্ছেনা, ওপাশে ফেরানো, ছেলেদের দিকে ফিরে শুয়ে ছিল বৌ। এই দিকে, তার দিকে ফিরে ঘুমিয়ে থাকতেও তো পারত?

বৌয়ের মাথার নিচে বালিশ নেই। গুটিয়ে ভাঁজ করে নেওয়া একটা চাদর। মাথার বালিশ একটা ফেটেছে। গুটিয়ে, ওয়ারে গিঁট বেঁধে রাখা আছে তক্তাপোষের নিচে, ট্রাঙ্কের উপরে। বালিশের অভাবটা নিজের উপরেই পুরন করেছে বৌ।

ডানহাতে বৌয়ের মাথাটা একটু তুলে চাদরটা সরিয়ে বাঁহাতটা রাখতে রাখতে বৌ কি একটু জাগল? হয়ত জাগেনি, ঘুমের ঘোরেই সম্ভবত, একটু শব্দ করে নাক দিয়ে, আর, এদিকে ফেরে। হয়ত ঘুমের ঘোরেই এতক্ষণ-ঋজু শরীর ভেঙে হাঁটুটা ভাঁজ করে গুটিয়ে এনে মিহিরের গায়ে ঠেকায়। একটু ঘেঁষে আসে মিহিরের দিকে।

বাঁ-উর্দ্ধবাহুর উপর এলানো বৌয়ের মাথার চুলে একটা মিষ্টিকটু গন্ধ : একটা শান্তি — অভ্যস্ততার। বৌয়ের চুল কপাল মিহিরের গলায় চিবুকে ঠেকে আছে। মিহির চোখের পাতা নামিয়ে আনে, ছোট দুর্লক্ষ্য ঢোঁক গেলে একটা, চোখে কি জল এল? ডান হাতের তালু নরম তুলে আনল বৌয়ের রোগা কাঁধে।

আঁচলটা গুটিয়ে গলায়। ঢিলে, ছেঁড়া ছেঁড়া ব্লাউজের হুকের ঘাটগুলো, বাড়িতে পরার জামাকাপড়ে সচরাচর যেমন হয়, দু-তিনটের বেশি হুক বোধহয় নেইও, ব্লাউজে ঢাকা বৌয়ের গা অনেকটাই দেখা যায়, আলোর অভাবে খুব স্পষ্ট চেনা যায়না। তাও, দুটো হুকের মধ্যে অনেকটা ফাঁকে নুয়ে নেমে একটু বেরিয়ে থাকা বাঁ-বুকের বোঁটার ঘন কালচে বাদামি চামড়া মিহির কি সত্যিই দেখতে পায়, দেখতে পায় মলিন করুণ শরীরের একটি খণ্ড, নাকি ভেবে নিয়েছিল?

ব্লাউজের নরম কাপড়ের উপর দিয়েই বৌয়ের বাঁ বুককে ধরার চেষ্টা করে মিহির, আঙুলের মধ্যে, যত দূর সম্ভব। বৌয়ের শরীরে মৃদু নড়াচড়া ঘটে।

গোপালবাবুর লেখাটা পড়তে পড়তে একটা ভয়, একটা ভয় ছড়াচ্ছিল। ভয়টা তার ভিতরেই থাকে, মাঝে মধ্যে হঠাৎ টের পায় মিহির। ভয়টা তার ভিতরে আছে, সদাসর্বদা।

বৌয়ের কাছে, বৌয়ের শরীরের খুব কাছে এসে, এখন অন্ধকার, চারপাশে কেউ নেই, কেউ কোনো দিক থেকে তার দিকে তাকিয়ে নেই, বৌয়ের শরীরটা আবাস, নরম আশ্রয়, কেউ তাকে তাড়িয়ে দেবেনা : খুব কৃতজ্ঞ লেগেছিল মিহিরের, শরীরের আর আশ্রয়ের আরামে কৃতজ্ঞ।

বুকটা খুব ভালো করে, সম্পূর্ণ করে হাতের তালুতে ধরতে চায় মিহির। বাঁ-হাতের তালু আঙুল প্রসারিত ছড়িয়ে ব্লাউজের উপর উন্মুক্ত বৌয়ের পিঠে রাখে আর ডান হাতে হাত-বোলানোর মত মৃদু ক্রিয়ায়, ব্লাউজের হুক খোলে। একটা দুটো হুক খুলতেই পুরো ব্লাউজটা খুলে যায়। ব্লাউজটা সরায় বুক থেকে। বাঁ স্তনটা ধরে হাতের তালুতে আঙুলে। উষ্ণ, একটু নরম খসখসে একটা অনুভূতি। একদিন শীতের সকালে আমগাছের শিশির ছোঁয়া বাকলে হাত বুলিয়েছিল মিহির, যতদূর দেখা যাচ্ছিল হালকা কুয়াসায় রোজকার চেনা রাস্তাগুলোই অচেনা। সেই একই অচেনার অনুভূতি বৌয়ের স্তন থেকে হাতের আঙুলের ডগাগুলোয়। নিজের মুখে চিবুকে উষ্ণতার সঞ্চালন ঘটছে, টের পায় মিহির। বৌ পাশ ফেরা অবস্থান থেকে একটু বেঁকে শোয়, চিত হওয়ার দিকে, হয়ত ঘুমের ঘোরেই, মিহিরকে তার ক্রিয়ার অধিকারে চারিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল?

নিজের ডান কনুই বৌয়ের পেটের গভীরে ঘনিষ্ঠ করে মিহির। তালু দিয়ে ঠেলে, আঙুল বড় করে খুলে, বেঁকিয়ে, বৌয়ের এলিয়ে নুয়ে থাকা বাঁ স্তনটা পুরোপুরি ধরে নেওয়ার চেষ্টা করে ডান হাতের মুঠোয়। একটু চাপ। ব্যথা লাগার মত চাপ নয়, পুরো বুকটাকে উন্মুক্ত দ্বিধাহীন প্রত্যাখ্যানহীন নিজের প্রাপ্তির ভিতর অনুভব করার, নিজের প্রাপ্তিতে নিজেকে বিশ্বস্ত করে তোলার চাপ। তার, হ্যাঁ, তারই বৌ, তার নিজের বৌয়ের বুকে সে হাত দিয়েছে।

বাঁ হাতের তালু দিয়ে আরো ঠেলে মিহির। বৌয়ের শরীরকে নিজের শরীরের আরো সন্নিকটে আনে।

বৌ জেগে গেছে, নিজের মুখ আর চিবুক গুঁজে দেয় মিহিরের গলার খাঁজে। কপালটা ঘষে দু-তিনবার। বৌ-ও কি আশ্রয় খুঁজছে? ভাবে মিহির, রাতের বিছানায় একা, মিহির নেই, ওরও কি চারপাশটা একটা পোড়ো বন্দরের মত লাগছিল? কোনো জাহাজ আর এখান থেকে যাওয়ার নেই, কোনো জাহাজ আর আসার নেই।

নিজের ভিতরেই একটু অবাক হয় মিহির, পোড়ো বন্দরের ভাবনাটায়, এটা গোপালবাবুরই কোনো লেখায় সে পেয়েছে? কোন লেখায়? মনে করতে পারেনা। নাকি সে নিজেই এরকম ভাবছে — ভাবনাটা কোথা থেকে এল — সে কি গোপালবাবুর লেখার মত করে ভাবতে শুরু করল? সে কি পাগল হয়ে যাচ্ছে?

আজ অনেকক্ষণ বৌয়ের বুকে হাত দিয়ে রইল মিহির, হালকা, শ্লথ। দুটো বুকে হাত বোলাল, নিজের ওজনে বসে যাওয়া স্তন দুটোয় হাতের তালু ও আঙুল নড়াতে নড়াতে মিহিরের মনে হল, ঠিক তার নিজেরই মত, এতগুলো বছর চলে গেল, বৌ তার জীবন থেকে কী পেল? তেরো চোদ্দ আঠেরো বছর বয়সে বৌয়ের বুক এরকম ছিলনা, বুকের ভিতরের ভাবনাগুলোও আলাদা

ছিল নিশ্চয়ই, জীবনে কিছু একটা ঘটার কথা ভাবত, এখন, এখন কি আর ভাবে সেসব? কী পেল জীবন থেকে? বাচ্চাদুটো দুধ খেয়েছে এই বুক থেকে, ছোটটা এখনো খায়, আপ্রাণ সশব্দে, সেটুকুই মানে এই জীবনের?

দম আটকে আসে, দম আটকে আসে, দম বন্ধ লাগে মিহিরের। গোপালবাবু, গোপালবাবুর লেখার জন্যেই এরকম লাগছে তার।

এই সব কথা মাথায় আসছে। কী আছে ওই লেখাগুলোয়?

গোপালবাবু বুলাকে লিখছে। কোন বুলা — সেই বুলা, যাকে সে চিনত? না — অন্য কোনো বুলা? ওই বুলাকে সালওয়ার কুর্তায় কোথায় দেখল গোপালবাবু? নিশ্চয়ই ওই বুলা নয়। তাহলে কোন বুলা? বুলা কে? বুলার প্রতি মিহিরের একটা ক্লান্ত মনখারাপ আছে, তার বেশি কিছু নয়, তাহলে ওই লেখাগুলো, ওগুলো অমন ধাক্কা দেয় কেন তাকে? কেন মনে হয় সে একটা ফাঁকা জায়গার মধ্যে দিয়ে শেষহীন ছুটছে? পায়ের নিচের বালি বসে যাচ্ছে, গনগনে তীব্র সব আলোয় চোখ ঝলসে যাচ্ছে, তবু কোথাও, কারো কাছে সে পৌঁছচ্ছে না, যেখানে পৌঁছনোর কথা ছিল।

কার কাছে? বুলার? নাকি অন্য কেউ? কাকে খুঁজছে মিহির? কাউকে খুঁজছে কি সে আদৌ? নাকি অন্য কিছু?

গোপালবাবুর লেখার অভিঘাতেই, নিশ্চয়ই তাই, অন্তত মিহির সেরকমই ভাবছিল, আজ, বৌয়ের শরীরের সঙ্গে মিহিরের সমস্ত প্রতিক্রিয়াগুলোই ভীষণ বদলে যায়। আজকাল যেমন যাচ্ছে। বৌয়ের বুকে, উর্দ্ধাঙ্গে হাত বোলাতে থাকে মিহির, অনেকক্ষণ যাবত, নিজের কাম-উত্তেজনা প্রশমনের জন্য আদৌ ব্যস্ত হয়নি আজ। তার নিজের দু পা দিয়ে বৌয়ের কোমর পা জড়িয়ে থাকায় উত্তেজিত যৌনাঙ্গে একটা স্থির চাপ রয়ে গেছিল, সেটুকুকে বাড়িয়ে তোলার কোনো বাসনাও তার ভিতর কাজ করেনা। বৌয়ের শরীরে বুকে, ক্রমে পেটে নাভিতে কোমরে, পোষাক সরিয়ে যোনিতে উরুতে হাত বোলাতে থাকে মিহির। ভালো লাগে তার এরকম করেই চলতে, করেই চলতে। কেন? স্নেহ? না অন্য কিছু? বৌকে একটু শান্ত আরাম দিতে, স্থিতি দিতে ইচ্ছে করে তার? কেন?

বৌয়ের কথা ভেবে একটা ভোঁতা অথচ ছেদহীন জ্বালা তার চোখে, গলার ভিতরে : কী পেল বৌ এই জীবনে? মিহিরের কাছ থেকেই বা কী পেল?

এতদিনকার দাম্পত্য, চেনা শরীর, মিহিরকে আলাদা করে সচেতনও হতে হয়না যে বৌয়ের এটা ভালো লাগছে — এই করে-চলাটা। মাথার নিচ থেকে ঘুরিয়ে বাঁ হাতের তালু রাখে বৌয়ের বাঁ স্তনে, গোল করে আঙুল ঘোরায় বোঁটার চারপাশের ছড়িয়ে থাকা কোমল ঘন রঙের এলাকায়, যা খুব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেনা, তবু আঙুলের ডগায় বুঝে নিতে পারে। মুখ নিয়ে আসে বৌয়ের ডান দিকের স্তনে। দাঁত লাগায়-না পাছে ব্যথা লাগে বৌয়ের, জিভ ঘোরায়। ঘুরিয়ে চলে।

ভালো লাগে, ভালো, খুব ভালো লাগে, ঝিনঝিনে নেশাগ্রস্ততার একটা ভালোলাগা ছড়ায় মিহিরের মাথায়। কাউকে সে আরাম দিচ্ছে, আরাম দিতে পারছে, কাউকে ভালো লাগাতে পারছে সে।

বৌয়ের বিয়ে হয়েছিল উনিশে। পড়াশুনো ক্লাস সেভেন অব্দি, মানে তেরো চোদ্দ। ওই সময়েই বৌয়ের বাবা মারা যায়। বাবা থাকত-ও অন্য জায়গায়, আর একটা পরিবার ছিল। বাবাকে পায়নি বৌ কোনোদিনই, নিজেই বলেছে। বাবা না-পাওয়া সেই ক্লাস সেভেন কিশোরী ইস্কুল যাওয়ার আর ফেরার পথে ছেলেদের পুরুষদের দেখত, আর নিজের বরকে ভেবে নিত, নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখত বরের, বরকে ভাবত, আশ্রয় খুঁজত, বাবার আশ্রয়। কী পেয়েছে বৌ? মিহিরের কাছে পেয়েছে সেই আশ্রয়? মিহির তো জানেও না, বলতেই পারবে না বৌ সারাদিন কী করে, কী ভাবে।

মিহিরের ভিতর একটা অনুতাপ? হাতে চাপ বাড়ে একটু। ডান হাতে বৌয়ের কোমর, ভিতর-উরু আর শেষ অব্দি যোনির ভিতর উপর-নিচে আঙুল বোলায়। কামক্রিয়ার বিবিধ সময়ে মিহিরের যেমন, অন্য অনেক কল্পনা, ছবি ভেবে-নেওয়া, বৌ-ও কি সেরকম কিছু ভাবছে? কাকে ভাবছে বৌ? কার সঙ্গে কামক্রিয়ার কথা? সিনেমায় দিলীপকুমারকে বৌয়ের খুব ভালো লাগে, পুরোনো সিনেমা যে দু-একটা দেখেছে, সানি দেওলকে ভালো লাগে। তাদেরই কাউকে ভাবছে বৌ? খুব নরম করুণ একটা আবেগ মিহিরকে ঘিরে রাখে। যে বৌ কল্পনাটা করছে সে সেই তেরো চোদ্দ বছরের কিশোরী, যার অনেক অনেক কিছু পাওয়ার কথা ছিল, অনেক গাছ অনেক আকাশ অনেক নির্ভরতা। কিছুই তো পেলনা। বৌকে অন্তত কল্পনা করে চলার আরামটা সে দিক, দিতে থাকুক, এটুকু অন্তত সে দিতে পারুক। খুব বিরাট একটা কিছু, শরীরে বা টাকায় বা ভালোবাসায় বা মনোযোগে সে তো দিতে পারেনি বৌকে।

মিহিরের কি কান্না আসে? সেটা আটকাতে আরো ঘনিষ্ঠ ভাবে বৌকে আদর করে চলে?

আদর করে চলতে চলতে একসময় অপারগ মিহির কি তার বেদনানিরুদ্ধ শ্বাস জোর করে ফেলতে ফেলতে, নাক দিয়ে, তার মুখ ও জিভ বৌয়ের স্তনে স্তনবৃন্তে ব্যস্ত ছিল, মিহির কি মনে মনে বলতে থাকবে, 'মা, মা গো', আর তখনি মিহিরের কি মনে হবে যে, গোপালবাবুর লেখায়, তার মাথায় যে আলোড়নটা সেটা কোনো একটা মায়ের জন্য, যে মাকে সে খুঁজছে?

এতক্ষণ ধরে বৌকে আশ্রয় দিতে চেয়ে, বৌয়ের শরীরে, বৌয়ের স্তনে রাখা মুখে, বৌয়ের সন্তানজন্মদ্বারে অনুপ্রবেশী আঙুলে সে কি আসলে কোনো এক অস্পষ্ট অপ্রাপ্য মাকে খুঁজছিল, নিজেই আশ্রয় খুঁজছিল?

পরে যখনি এটা মাথায় আসে মিহিরের, তখনি একটা তীব্র সঙ্কোচ, একটা লজ্জা, নিজে নিজেই চোখ কুঁচকে আসে, দম আটকে যায়, মুখ দিয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে ফেলে মিহির, এ কী বীভৎসতা তার ভিতর? সে কি পাগল হয়ে যাচ্ছে? আর, এর পুরোটার জন্যেই সে দায়ী করে গোপালবাবুকে, গোপালবাবুর বুলা-সংক্রান্ত এই লেখাগুলোকে। এখনো অন্য কেউ জানেনা তার এই সব উদ্ভটতা, কিন্তু এরকম যদি সে করতেই থাকে, গোপালবাবুর ওই লেখাগুলো পড়তেই থাকে, তাহলে নানা ভাবে নানা জনের সামনে এসব প্রকাশ হয়ে পড়তেই পারে। এগুলো কী? কেন হচ্ছে এসব?

এগুলোকেও ঠিক সেই একই রকম ভাবে বুঝতে পারেনা মিহির, যেমন পারেনা গোপালবাবুর বুলার লেখাগুলোকে। সবগুলো লেখাই যে ঠিক বুলার, তাও নয়। দু-একটা লেখায় একবারো নেই বুলার নামটা, কিন্তু লেখার ধরনে কী একটা মিল আছে, আর প্রত্যেকটা এই রকম লেখার উপরেই চৌকো একটা চিহ্ন □ যা দেখে ওগুলোকে এই লেখা বলে চিনতে পারে, এই স্তূপাকৃতি খাতা আর ভিতরকার রাশি রাশি লেখার ভিতর থেকে খুঁজে খুঁজে।

বুলার নাম একবারো নেই এইরকম একটা লেখা বেশ ছোট, মাত্র দেড় পাতার। লেখাটায়, শুধু এই লেখাটায় কেন, গোপালবাবুর এই সমস্ত লেখাতেই শুধু বাস, শহর, কলকাতা। গোপালবাবু কি শুধু ঘুরে বেড়াত কলকাতার রাস্তায়? তাহলে অফিস? মাস মাস যে মাইনে আনত — ব্যাংকের চাকরি — তবে? আর, রিটায়ার করার পর থেকে হয় বাড়িতে, নয় দূরে কোথাও বেড়াতে যাওয়া। কম বয়সে, জোয়ান ছিল যখন, তখনকার স্মৃতি? তখন মেয়েরা কি সালওয়ার কুর্তা পরত? তাহলে বানানো? কেন বানাত এসব গোপালবাবু? কেন লিখত? লিখে কী হয়?

> আলো তার ছক বদল করে। ছক থেকে ছক, ক্যালেইডোস্কোপ জ্যামিতির মাপে। রঙ থাকা মানে আলো থাকা। রঙ থাকা মানে অন্ধকার থাকা। যখন আলো অন্ধকার বলে কিছু থাকে না তখন প্রাকজন্ম দ্রবণের ভিতর উর্দ্ধবাহু কে দাঁড়িয়েছিল? তখন কি বাহু ছিল? দাঁড়ানো? শব্দের বাইরে ছবির বাইরে সেখানে কে যেতে পারে? সেখান থেকে আসে : সেখানে যেতে পারেনা? কী আসা আর কী যাওয়া?
>
> তুমি কি দেখেছ সেই ছবি রঙিন হাফটোন ব্লকের ছায়াময় সন্ধ্যাভাষায় : শিশু তার মায়ের জঠরে : সেখানেও সে আঙুল খায়? হাফটোন ব্লকের ছবি তুমি কি খেয়াল করেছ? আসলে কিছু বিচ্ছিন্ন বিন্দু — বিন্দুর থাকা বা না-থাকা : বিন্দুর জন্য স্থিরীকৃত স্থানাঙ্কে। তার স্থানাঙ্কগুলোর বাইরে : বিন্দুর থাকা না-থাকার জন্য সূচিত ভূমির বাইরে : শুধু শূন্যতা।
>
> শূন্যতাও একটা শব্দ। আমি শব্দের বাইরে যেতে পারিনা। আমি সন্তানের জন্ম দিতে পারি। জন্ম সম্বন্ধে হাফটোন ছবির এই পুস্তক পড়ে ওঠার আগে ও পরে আমি কত সন্তানের জন্ম দিই। হে মাংস হে চামড়া তোমরা শুধুই প্রবাহ, তোমাদের ভিতরে বাইরেও প্রবাহ : বাইরে বায়ুর, ভিতরে রক্তের : তার ভিতরেও কম্পন, রক্তের নিচে লোহিতকণিকা, তার নিচে কোষ নিচে অণু নিচে পরমাণু, আরো নিচে পরাপারমাণবিকতা : আমি তোমাদের খুঁজব না। তোমরা আমায় ঘিরে থাকো হে প্রবাহ হে শরীর।
>
> আমি তোমায় পাই।
>
> কোনো একটি (একই) গাছের নাম সোনাঝুরি কি হতে পারে যদি সেই গাছকে তুমি আকাশমণি নামে ডেকে থাকো? আকাশমণি নাম হওয়ার আগে ও পরে সেই গাছ পঞ্চায়েত থেকে রোপন করা হয়, তুমি কি জানো পশ্চিমবঙ্গ অরণ্যায়নে প্রথম হল? পঞ্চায়েতি রাজে গাছ বেড়ে ওঠে পুকুরের পাড়ে
>
> আমি সে গাছের নাম আকাশমণি দিইনি, সোনাঝুরিও নয়, আমার বৌয়ের নাম রাধা নয়, আমার ছেলের নাম কেলো নয়, আমি চক্রাকৃতি প্রবহমান প্রবাহের পিছু পিছু চাঁদের জাহাজে গিয়ে উঠিনি, প্রবাহ, ঢেউ ভাঙে, গড়ে, ভাঙে, দুটি ঢেউয়ের ভিতরে ভিতরে শূন্যতা, ঢেউ ঢেউ ঢেউ ঢেউ, ঢেউ

এই লেখাটায় অনেকগুলো বাক্যের শেষে দাঁড়ি নেই। অথচ নতুন প্যারা। এরকম হয় নাকি? গোপালবাবু কি ভুল করে লিখেছে? আবার এক জায়গায় তো দাঁড়ি দিয়েও কেটে দেওয়া।

এই লেখাটা তবু কাউকে একটা তুমি তুমি করে, উদ্দেশ্য করে লেখা, হয়ত বুলাকেই। শুধু নাম করেনি। কোনো কোনো লেখাতে সেটুকুও নেই।

> আমার সমস্ত রক্ত একসঙ্গে বদলে গেল, রডে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। কাঠের খাঁজকাটা মেঝে কাঁপছিল। এক ধরনের বেদনাকে টের পাই বাঁ পায়ের গোড়ালিতে : বহু হাঁটার ক্লান্তি। বেদনা কারণ গতিশীল বাসের মেঝেতে কাঁপন থাকেই, ব্রেক মারার, ব্রেক না-মেরে গতিশীল থাকার। জীবন্ত এবং অ্যাক্সিডেন্টে মৃত পথচারীদের বাঁচিয়ে বাস চলে, আমি রডে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। রডের শরীরে প্রাত্যহিক নিত্যযাত্রীর বহু বছরের হাতের গতির মসৃণতা। আমার কাঁধে আমি রডের ঠান্ডা টের পাই, শীতকাল সবকিছুকে ঠান্ডা করে, হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। আমার চোখের সামনে কিছু নেই। চোখের পাশ ঘেঁষে অন্যান্য বাসযাত্রী সাবধানে আলগোছে নড়াচড়া করছে, পাছে আমার দৃষ্টিতে ঢুকে পড়ে, দরজার ফাটল দিয়ে পলায়মান ইঁদুর, ছোটবেলা থেকে শুধু সুড়ুৎ আর সুড়ুৎ, ফাটল বেয়ে অন্য ঘরে গিয়ে ঘাড় তুলে দম নিয়ে ফুসফুস-রক্ষা, লোকগুলো আমার দৃষ্টি থেকে পালাচ্ছিল, লোকগুলো আর লোকের বৌগুলো।
>
> আমার সমস্ত রক্ত বদলে গেল, শান্ত ও গম্ভীর ভাবে, জাপানি ড্রামের শব্দ বৌদ্ধ মুড়কি বিতরণে, হাওয়া ও মুড়কির ঘাত-প্রতিঘাতে শান্ত ফিসফিসে শব্দ রক্তবদলের, ট্রান্সফিউশন, বদলাতে থাকা রক্তের স্রোতে জোয়ার আর জোয়ার,

কতদিনের জমে থাকা সময় জঞ্জাল আর জল হাইড্রান্ট ফাটিয়ে উঠছে গব গব গব, গব গব গব রক্তের ধাক্কা, আমি রক্তের বন্যায় ভেসে যাচ্ছি আর ধাক্কা খাচ্ছি আর ভেসে যাচ্ছি।

একটা মেয়ের কাঁধে শানানো চকলেট রঙের এমব্রয়ডারি করা কার্ডিগান, প্রান্তটুকু দেখা যায় শুধু, এস-বাস-সবুজ ওড়নার ভাঁজ, আমি মেয়েটার কাঁধ থেকে সব রক্ত শুষে নিচ্ছিলাম, এমন সময়ে আমার সমস্ত রক্ত একসঙ্গে ঠান্ডা হয়ে গেল। আমি টের পাচ্ছি উত্তাপ-অবস্থার বদল। আমি একটুও বদলাইনি, তোরা বিশ্বাস কর, শুধু রক্তটুকু বদলে গেল, সমস্ত রক্ত, আমার সমস্ত রক্ত।

তখন ডাক্তারখানার অবসন্ন আলো ভিতরের রাস্তার সদ্যপিচকরা বডিতে ছেনালি করছে। জ্যোতিষের চেম্বারে দাঁড়িয়ে একটি দাড়িওয়ালা লোক হাসলে তার দাঁতটুকু দাড়ির কালোর মধ্যে স্পষ্টতায় পরিদৃশ্যমান হয়। পাশের নারীটির গায়ে চাদরঢাকা। চাদরের নিচে ও কি কিছু গোপন করছে? ওর নষ্ট গর্ভ, নষ্ট বাচ্চার গর্ভ? প্রসাধন করা চামড়ার নিচে চামড়ার নিচে ওর স্রাব আর নড়ছে না, মৃত নষ্ট বাচ্চা বিইয়ে তবে এসেছে এখানে? আমি

পিচব্লেন্ড ফোটানোর গাড়ির কালো ড্রামের গায়ে কামোত্তেজনা দেখলাম, কী মাদকতা কালো ভেজা যৌনচামড়ার।

আমার সমস্ত রক্ত একসঙ্গে বদলে গেল বলে আমি আমার নিজেরই কামকে কামের বাইরে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি।

এই লেখাটা পড়তে পড়তেই প্রথম ভাবনাটা মাথায় এল মিহিরের, পরে অন্য লেখায় শুধুই মৃত্যুর প্রসঙ্গে যা কিছুটা সমর্থনও পেল। কিন্তু লেখাগুলো তো অনেকটা শব্দকল্পদ্রুমের মত, কী যে আছে লেখাগুলোয়, আর ঠিক কী যে নেই কিছুতেই সেটা বলা সম্ভব নয়। অন্তত মিহিরের পক্ষে তো অসম্ভব বটেই।

মিহিরের মনে এল, বুলা মরে যায়নি তো? ভাবনাটা মিহিরের মাথাতে ধক করে উঠেছিল। মাথায় এসেছিল সকালে ঘুম থেকে উঠেই। তখনো বিছানা ছাড়েনি, পাশে ছেলেটা দুলে দুলে নামতা পড়ছে, যখনি মা-র গলা কানে কানে আসছে। আর তারপরই কোলে ধরা বেড়ালটার মুখ হাঁ করিয়ে মুখে আঙুল দিচ্ছে। মশারিটা খোলা আর ছোটছেলেটা যেভাবে শোয়ানো হয়েছিল রাতে, তার ঠিক উল্টোদিকে মাথা করে ঘুমোচ্ছে। গড়িয়ে যাতে না পড়ে-যায় তাই বৌ বিছানা ছাড়ার আগে কিছু একটা গুটিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে তক্তাপোষের ধারে তোষকের নিচে, বিছানাটা অনেক উঁচু হয়ে গেছে, যেন পাহাড়ের উপত্যকা।

মনে হল, একবার যাবে সে? এখনি? গিয়ে জেনে নেবে বুলার খবর — বুলা কেমন আর কতটা বেঁচে আছে। তারপরই মনে হল, কোথায় যাবে? বুলার বাড়িতে? বুলার বাবামার কাছে? তারা তো মিহিরকে চেনেও না। এত কাছাকাছি বসবাস, খুব বেশি হলে মুখটুকু চেনা লাগতে পারে। আর, তারা তাকে তাদের বিবাহিত মেয়ের খবর দেবেই বা কেন?

গিয়ে যদি কিছু না জিগেশ করে, কিচ্ছু না, না-ঢোকে অব্দি বাড়িতে?

কিন্তু তাহলে সে জানবেই-বা কী করে?

একটা দ্রুত চিন্তার গতি যেটা তৈরি হচ্ছিল, ক্রমে মরে যায় মিহিরের ভিতরে। চারপাশটা আবার শান্ত হয়ে আসে। নামতা, বৌ কথা বলছে বাসনমাজারত ঝি-এর সঙ্গে, বাসনের আওয়াজ, ঘ্যাঁস-ফেলা ইঁটের রাস্তা দিয়ে সাইকেল গেল।

যদি যায়ও, দু-চার বার, বুলাদের বাড়ির সামনে দিয়ে ঘোরাফেরাও করে, কী বুঝবে? কী জানতে পারবে সে?

আর, জানার আছেই বা কী? এই বুলার খবর সে জানতে চাইছেই বা কেন গোপালবাবুর লেখা পড়ে? এই বুলা তো ওই বুলা নয়। এই বুলাকে তো গোপালবাবু চিনতই না। নাকি চিনত? সে জানল কী করে? কী করে সে নিশ্চিত হচ্ছে যে দুটোই একই বুলা নয়?

না, না, এসব সে ভাববে না — এভাবে ভাবতে গেলেই সবকিছু কেমন গুলিয়ে যায়। একটা ভাবনার থেকে আর একটা ভাবনা, তার থেকে আর একটা। শুধুই জটিল হয়ে যায়, গুলিয়ে যেতে থাকে।

জোর করে নিজেকে নিজের চারপাশে ফিরিয়ে আনে মিহির। ঘরের বাইরের জীবনে যেমন, এখানে এই ঘরের ভিতরকার জীবনেও নিজেকে বহিরাগত মনে হয় তার, এখন, যেমন আজকাল মাঝেমাঝেই হয়। বহিরাগত, বাইরে থেকে গুঁজে দেওয়া। জীবনের, সাংসারিক এই জীবনের স্রোতটা চলছিল — বৌকে ঘিরে, বৌ আর ছেলেদুটো আর ঘর, ঘরের কাজ, ঘরের সময়, ঘরের দ্রব্যসামগ্রী, ঘরের মানুষের ঘরে ঢোকা ও বেরোনো, খাওয়া ও ঘুমোনো। শোয়ার ঘরটা, লম্বা বারান্দা, ও দিকে রাস্তার দিকে মুখ-করা দোকানঘর, আর রান্নাঘর, রান্নাঘর এবং দোকানঘরের মধ্যবর্তী শান-করা মেঝের ওই প্রায়-বারান্দা অংশটা, যার তিন দিকে ঘর এবং এক দিকে বারান্দা, দেওয়ালে জানলার বদলে সিমেন্টের জাফরি — এই মোট পাকা-ছাদ-আবৃত ভূমি। আর সিএমডিএ-র বানানো ছয়কোনা পায়খানাও। এর বাইরে মাথায় পুরোনো জং-ধরা আর ছাদহীন উঁচু তিন-ইঞ্চি গাঁথনির দেওয়াল আর এক দিকে শিকলে আটকানো গ্যালভানাইজড শিটের দরজার বাথরুম। তার গায়ে দুটো পাশাপাশি চৌবাচ্চা, যা কোনো এক কালে, দূর অতীতে কি ব্যবহৃত হত, যখন টিউবওয়েলটা ছিলনা, পায়খানা আর বাথরুমের মাঝামাঝি, ছোট পাতকুয়ো থেকে জল নেওয়া হত? — মিহির ঠিক মনে করতে পারেনা। আধভাঙা টিনের চালের নিচে রান্নাঘরের বাইরের দেওয়ালের গায়ে একটা চালাগোছের, সেখানে ঘুঁটে গুল আর কাঁকড়া এবং তেঁতুল উভয় রকমের বিছেরা থাকে, বাচ্চাদের ভাঙা খেলনা, বাতিল বাসন যা বিক্রি হয়নি। বেড়ালেরা বছর দুবার (নাকি তিন?) সেখানে বাচ্চা দেয়, ঘেঁটি কামড়ে বাচ্চাদের এক একবার এনে দাওয়ায় তোলে, আবার ফেরত নিয়ে যায়, এলাকার হুলোদের শিকারউৎসাহী ডাকাডাকির সঙ্গে সঙ্গতি

রেখে। এর বাইরে কিছুটা জমি, রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশন, অর্থাৎ আর-আর পর্চা মোতাবেক পাওয়া দলিলের বরাদ্দ প্লটে এতক্ষণ উল্লিখিত ঘর আর প্রায়ঘর এবং এর সঙ্গে গোপালবাবুর ঘরটা বাদ দিলে যতটুকু জমি বাকি থাকতে পারে। ঠিক পায়খানার পিছনে, বাথরুমের নালির পাশে একটুখানি জমি বাদ দিলে, ভেজা ভেজা, কাদা কাদা, কেন কে জানে ওখানটায় দু-চারটে দুর্বো ছাড়া ঘাস খুব একটা দেখেনা মিহির, আর অবশিষ্ট সবটুকু মাটিই গাছে গাছে ঠেসে ভরে দেওয়া। তাতেও কটা গাছই বা আছে — পেয়ারা দুটো, দু-তিনটে পেঁপে, একটা নারকেল, দুটো সুপুরি। অথচ বাইরে থেকে বাড়িটাকে দেখলে ভীষণ গাছ-গাছ মনে হয়, বাড়ির ঠিক বাইরের কোণেই রাস্তার বড় নালার কালভার্টের পাশে রাস্তার জমিতে ওই বিশাল ঝাঁকড়া আমগাছ, বোধহয় পিডব্লুডির, কত বছরের পুরোনো কে জানে — শ, হাজার, লক্ষ? — মিহির তার জন্মের আগে থেকেই বোধহয় দেখে আসছে।

এই সমস্ত জায়গাটা কার? কে থাকে এখানে, কে বাঁচে এখানটায়? বৌ? এটা বৌয়ের পৃথিবী? সেখানে ওই বাচ্চারা আছে, বেড়াল, পোকামাকড়, গাছ, গাছের বেগুন, আমগাছের শুকনো পাতা এবং ডাল, জাঁতি দিয়ে সুপুরি কেটে রোদে শুকিয়ে কৌটোয় রেখে দেয় বৌ, আর এই সব কিছুর সঙ্গে মিহিরও আছে। এই পৃথিবীতে কখনো যদি কিছু বলার বা করার থাকে মিহিরের, সে বৌয়ের কাছে যায়। বৌ-ই এখানের নিয়ন্তা।

দিনের বেশিরভাগটা সময় বৌ থাকে রান্নাঘরের সামনে ওই প্রায়বারান্দা জায়গাটুকুতে। ওখান থেকে সারা গৃহ আবাস পৃথিবী তার নজরের ভিতর, শুধু একটা ঘর পেরিয়ে গোপালবাবুর ঘরটা বাদে।

সেইজন্যেই কি গোপালবাবুর ঘরে সে আশ্রয় নেয়? এই পৃথিবীর বাইরে, বৌয়ের পৃথিবীটার বাইরে সে পা রাখতে চায়? কেন? কেন এই পৃথিবীটার বাইরে সে যেতে চায়? এখানে তার ভালো লাগেনা কেন?

খুব বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করত তার, করে। এসবিএসটিসির চাকরিটা পাওয়ার ঠিক আগে আগে, যখনো এই চাকরিটা কী সেই বিষয়ে কোনো আন্দাজই তার তৈরি হয়নি, সে ভাবত ট্র্যান্সপোর্ট-কর্পোরেশন — মানে কত জায়গায় সে যেতে পারবে। আবার ওরকম ভাবে সত্যিই কি যেতে চাইত সে? বাসে করে? আঁট একটা সিটে জমাটবাঁধা ইস্ক্রুপ-আঁটা একটা পিণ্ডের মত?

ইস্কুলের ছেলেদের ভিতর তুষার ওর দাদার সঙ্গে বিজনেস করে, আন্দামানে মাল নিয়ে যায়, ওখান থেকে মাল আনে। ওর কাছে শুনেছে জাহাজে যাওয়া মানেও ওরকম গাদাগাদি করেই যাওয়া। কিন্তু তারপর? তুষার বলেছিল এমন দ্বীপ আছে অনেক অজস্র অগুন্তি যেখানে একটাও মানুষ নেই, বা দুটো-চারটে মানুষ, আর সারাদিন ধরে সেই বালি সমুদ্র ফেনা পাহাড় গাছ আর বালির মধ্যে হাঁটতেই থাকো, হাঁটতেই থাকো। সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, ঝড়, বৃষ্টি, রাত আর দিন।

বৌ-ও বেড়াতে যেতে চায়। অনেকে যেমন যায়, পুজোর সময়, রিজার্ভেশন করা সিটের টিকিটে ট্রেনে চড়ে। ছেলেদের আর তার জন্যে খাবার বানিয়ে একটা বড় টিফিন ক্যারিয়ারে ভরে নেবে, নয়তো ট্রেনে খাবে কী? তারপর পুরী বা বেনারস বা রাজগির। যেখানে একটা ঘর ভাড়া নেবে। আর পুরী হলে সমুদ্রের পাড়ে ফেলা রাশিকৃত ঝকঝকে সমুদ্রমৎস্যের থেকে বেছে বেছে নধর রেশমি পমফ্রেট আনবে মিহির, বৌ সেগুলো ভেজে দেবে, ঝোল করে দেবে, আর একটু চাটনি, অত সমুদ্রের মাছ খেলে একটু টক খেতে হয় সঙ্গে।

বৌ তার মামাদের সঙ্গে একবার বেনারস গেছিল। সেখানে বাজারে মাছ বিক্রি হয় একদম কাঁটা ছাড়া, মধ্যে শিরদাঁড়াকে রেখে দু-পাশে দুটো ফালি মাছকে দক্ষ মসৃণ কাটারিতে টেনে বার করে আনা হয়, নারকেল পাতা থেকে ঝাঁটার কাঠি ছাড়ানোর মত। আর একটা গলি আছে সেখানে আচারের দোকান আর আচারের দোকান। কত কিছুর আচার, বাঁশের অব্দি। সন্ধেবেলায় সবাই মিলে গঙ্গার ঘাটে বসে তীর্থদর্শন আর কোলাহল করতে করতে দেখা নদীর জল, আলো ভেসে যাচ্ছে, দূরে একটা আলো, ওই আর একটা, ছোটমাসির ছোটছেলে হামাগুড়ি দিয়ে গঙ্গার দিকে চলল, আলো ধরবে, এই পড়ে আর কী।

বৌয়েরা যে পাড়াটায় একটা ভাড়াবাড়িতে উঠেছিল, সেই পাড়াটার নাম সোনারপুরা। সো না র পু রা সো না র পু রা, নিজের মনে বলেছিল মিহির, বারবার, কেমন ঝিমঝিমে একটা অনুভূতি। সেখানের বাড়িগুলো কি খুব পুরোনো পুরোনো? ইঁটগুলো পাতলা পাতলা, চ্যাপ্টা আমসত্ত্বের প্যাকেটের মত, সেগুলোর গায়ে হাত দিলেই কি একটা মসৃণ আরাম? বৌ বলতে পারেনি। মিহির দেখছিল সোনারপুরার বাঁকা গলির কোণে ফাটা ফাটা লালশানের রক, গোল খিলানওলা দরজা, একজন বুড়ো মুসলমান দর্জি বিকেলের পড়ন্ত আলোয় সেলাই করেই চলেছে মাটি থেকে শুরু হওয়া নিচু জানলায় বসে, একটা বড় ছাইছাই রঙের ছাগলের পিছন ঢিমে হেঁটে গেল দুটো সাদা কালো বাচ্চা ছাগল, টুকটুক টুকটুক টুকটুক।

সে এসব কোথায় দেখল? এগুলো কি তার গত জন্মের স্মৃতি, তাকে শুধু ডাক দিয়ে ফেরে, ফিরে যেতে বলে সেইখানে? তাও তো না, এরকম তো কত ছবি সে বানায়। নানা জায়গার। কোথায় একটা পেশোয়ারের ছবি দেখেছিল। পিছনে দুর্লক্ষ্য একটা ছোট সিগারেট-পানের দোকানের অংশ। তারপর সে দেখতে পাচ্ছিল সেই দোকানের আংশিক পরিদৃশ্যমান পান-বিক্রেতার ঘর-সংসার। ঘরের খুঁটিনাটি জিনিষপত্র। এইসব জায়গা সমস্ত জায়গা তো তার পূর্বজন্মের স্মৃতি হতে পারেনা? তাহলে?

এইসব, সমস্ত জায়গায় তার যেতে ইচ্ছে করে। বাসে নয়, ট্রেনে নয়, হেঁটে হেঁটে। রাস্তা, রাস্তার কোনো শেষ নেই, রাস্তা ধরে হাঁটছে সে, হাঁটছে, হেঁটেই চলেছে। অচেনা বড় একটা পাখি বসে, কালো আর ধূসর রঙের, ধুলো ওঠা রোদগনগনে রাস্তার পাশে, ডানদিকে একটা পুরোনো শুকনো চটার বেড়া, যেন মানুষের দেওয়া নয়, প্রাকৃতিক ভাবেই গজিয়েছে, এত দীর্ঘ তার

প্রসার, এত দীর্ঘ শেষহীন ভাবে চলেছে তার পাশে পাশে ডানদিক ধরে, বাঁদিকে পোড়ো জমি, আগাছা আর জঙ্গল, সেই জমি পেরিয়ে পাহাড়, দূরের গুলো সবজে নীল, কাছের গুলো গাঢ় কালচে খয়েরি যেখানে পাথর, আর লালচে সবুজ যেখানে গাছ, এই সব পাখি বেড়া গাছ আর পাহাড় পেরিয়ে সে চলেছে, চলেছে আর চলেছে, থামছে না, শরীরের পেশিতে পেশিতে উরুতে হাঁটুতে গোড়ালিতে ভেঙে পড়া শ্রান্তির আরাম : সে হেঁটে চলেছে।

এরকম হেঁটে হেঁটে বেড়িয়ে পড়ার পরিকল্পনা তো সে রোজই করে। এমনকি সঙ্গে কী কী নেবে তার একটা হিসাবও সে করে রেখেছে। পরনে একটা প্যান্ট আর জামা, আর কাঁধে একটা ঝোলায় একটা কম্বল, একটা গামছা, আর একটা প্যান্ট আর জামা, একটা খাতা, একটা ডটপেন আর এক প্যাকেট মানে বারোটা কালো রিফিল। আর একটা লাঠি, যদি মেলে।

খাতা আর রিফিল, সে রিফিল আবার কালো রঙের, নিজের মনেই একটু লজ্জা পায়, হেসেও ফেলে মিহির। সে আসলে গোপালবাবুকে নকল করছে। গোপালবাবুও খাতায় লেখে, কালো কালিতে।

খাতা-রিফিল নয় বাদই দিল, শুধু অন্যগুলো — সেগুলো নিয়ে বেরিয়ে পড়তেই পারত সে, যদি না এই ছেলে বৌ, এই সংসার, আর সংসার চালানোর প্রত্যেক মাসের টাকার সংস্থান ওই চাকরিটা তাকে করে চলতে হত।

এই কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই দম আটকানোর চেনা অনুভূতি ফিরে আসে মিহিরের। একটা অনুতাপ? একটা রাগ? বিয়ে করে ফেলল বলে? ছেলেমেয়ে জন্মে গেল বলে?

না হলেই কি সে যেতে পারত? বছরের পর বছর ধরে হাঁটার সময় কী খেয়ে সে বেঁচে থাকত, কে তাকে খাবার যোগাত?

বিয়ে হোক ছাই না-হোক, ছেলেটা বা ছেলেদুটো জন্মাক ছাই না-জন্মাক, বেরিয়ে পড়া তার হত না, এটা কি নিজে নিজে জেনে ফেলেছে মিহির? শুধুই জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়ানো, রোদ্দুর ছায়া তার হাতে গায়ে, নিশ্চয়ই কপালেও, আর তাকিয়ে থাকা, অনিশ্চিত কোনো উদ্দেশ্যে। আর ডাক শুনতে থাকা। আর নিজের চারপাশের প্রতি ক্রমে আরো পরিশ্রান্তি, আরো বিচ্ছিন্ন আর নির্বাচনহীন হতে থাকা। এই জন্যেই কি বুলা? বুলা সেই পথ, যা তাকে ডাকতেই থাকবে? গোপালবাবুরও কি তাই? তাই কি গোপালবাবু এত মৃত্যুর কথা লেখে? বুলার মৃত্যু তো সত্যিই তো এক ধরনের নিশ্চিন্ততা দিতে পারে গোপালবাবুকে, ক্রমে দূরে সরে যেতে থাকা চাঁদের মত, যেখানে কিছুতেই পৌঁছে-ওঠা হয়না। মাঠের ওপারে ঠিক বুলাদের বাড়ির ছাদের ওপাশে চন্দ্রোদয় হত, তখন এইখান থেকেই দেখা যেত ওদের বাড়িটা, চাঁদছায়া নারকেল গাছের উচ্চকিত এবং স্বতন্ত্র অবয়বের উচ্চারণে চিনে নেওয়া যেত ওদের বাড়িটা, আর মিহির ভাবত, ওইটুকু গেলেই চাঁদ পাওয়া যেতে পারে, বুলাদের বাড়ি অব্দি গেলেই, বুলাদের বাড়ি, যার উপর প্রতি জ্যোৎস্নার রাতে চাঁদ জেগে ওঠে।

গোপালবাবু মৃত্যু লেখে, অজস্রবার, মৃত্যু আর রক্ত, লিখে চলে, শুধু বুলাকে এই আরো বুলা, আরো অপ্রাপ্য করে দেওয়ার জন্যে? বুলা সত্যিই মরে গেছিল? গোপালবাবুর বুলা?

লেখার ভিতরে এক জায়গায় মৃত বাচ্চার নষ্ট বাচ্চার গর্ভ, সেই গর্ভ বিইয়ে এসেছে এক নারী — এমনটা নয় তো যে বাচ্চা হতে গিয়ে বুলা মরে গেছিল? মিহির ভাবে, মনে করার চেষ্টা করে, সে তো বুলাকে দেখেছে, নিজের বাচ্চা মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে, ভোটের দিন সকালে। ভোট দিতে এসেছে, ভোট নিশ্চয়ই শ্বশুরবাড়িতে এখনো ওঠেনি, এখনো বাপের বাড়ির ভোটারলিস্টেই নাম, অথবা হয়ত মেয়েকে নিয়ে একবার বাপের বাড়িতে ঘুরে যাওয়া। বোকারোয় চাকরিরত সম্পন্ন ইঞ্জিনিয়র স্বামী আর রিটায়ার্ড ট্যাক্স অফিসার শ্বশুরের জীবিত শাশুড়ির সংসার ফেলে নিশ্চয়ই খুব রোজ রোজ বাপের বাড়ি আসা যায়না। আরো বাচ্চাটা মেয়ে না হয়ে ছেলে হলে হয়ত আর একটু অধিকার আদায় করতে পারত। আবার ওই শ্বশুরবাড়ি এমনটা তো নাও হতে পারে — হয়ত ওরা খুবই ভালো। মিহির কি নিজের মনে মনে এটা যাচ্ছা করে যে বুলা খুব ভালো না-থাকুক। সে কি চায় বুলাকেও একটা অসাধ অসফলতা ঘিরে থাকুক — কেন? ভোটের দিন, বুলা থেকে দূরে, পুরুষ ভোটারদের ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে দেখে মিহির, বুলার গলায় চওড়া সোনালি একটা হার, কানে আর হাতেও সোনা, সম্পন্ন গয়না, নিজের বৌয়ের গায়ে কোনোদিন যার কোনো সমান্তরাল দেখে উঠতে পারেনি মিহির, সোনাগুলো বেশ চকচক করে, চারপাশে চড়া আলো, বুলার শরীরে হলুদ, বাসন্তী হলুদ রঙের শাড়ি, চওড়া পাড়, শাড়িটার ছাপাতেও একটা সম্পন্ন অন্যরকমত্ব, বুলাকে খুব রমণীয় লাগছিল। একটু ভারি হয়েছে কি ওর শরীর? বিয়ের শাঁসেজলে? ওর শরীরের সমস্ত মাংসকে বাসন্তী হলুদ, সাদা ব্লাউজ, মিহির কি অনুভব করছিল? যেন বুলা তার বিবাহিত উরু নিয়ে লাল শানের মেঝেতে পা দাপায়, হাতের চুড়ি বালা কঙ্কণও নড়ল, ঠোঁট ফোলাল বুলা, নাকের দুপাশে গালের চামড়া কুঁকড়ে তুলল উপরে, আর পাঁটার মাংস খাওয়া জৈষ্ঠ রবিবারের দুপুরে, বিছানায় শোয়া মিহির তার হাত রাখল বুলার উরুতে, শাড়ির উপর দিয়েই, হাতেই কি অনুভব করল দাপানো পায়ের কাঁপতে থাকা উরুর চামড়ায় মৃদু ঘাম, এই পোষাকের অন্তরাল ভেদ করেই? ঝমঝম করে উঠল মেঝে, চারপাশ, হাওয়া, রোদ্দুর — ঘাড় কুঁকড়ে, মাথা নামিয়ে, চোখ সোজা পুরো খুলে মিহির দেখে ভোটার লাইন থেকে আর একজন ভোটার ঢুকে গেল বুথের কন্দরে।

মেয়ের সঙ্গেই তো দেখেছে বুলাকে, মেয়ে সঙ্গে ছিল, তাহলে গোপালবাবু ওসব লিখেছে কেন? তারপরেই মনে পড়ে, আবার সে গুলিয়ে ফেলছে, গোপালবাবুর বুলাকে সে তার বুলা বলে ধরে নিচ্ছে কেন? তারা আলাদা, নিজেকে জোর করে শোনায় মিহির। গোপালবাবু অন্য কারো মৃত্যুর কথা লিখেছে। অন্য কোনো বুলার। বা হয়ত বুলারও নয়, নিজেরই মৃত্যু, বা বুলাই

হয়ত মৃত্যু : মৃত্যুকে উদ্দেশ্য করে লিখে যাচ্ছে গোপালবাবু। মৃত্যুকে উদ্দেশ্য করে, মৃত্যুকে অস্বীকার করে। লিখতে গেলে তো একটা আধার লাগেই। বুলার মৃত্যুর আধারে নিজের মৃত্যুকে লিখছে গোপালবাবু।

মানুষেরা, নির্বোধেরা, জানতেও পারল না, আমি তোমায় বদলে দিলাম। তুমি মরে গেছিলে, তাও তুমি রয়ে গেলে, তোমার মৃত্যু হলনা, মৃত্যুঞ্জয়ী তুমি বুলা। তোমায় ওরা বরফে রেখেছিল, সাদা বরফে। সাদা বরফে তোমার শরীর সাদা। কালো শরীর সাদা, আরো সাদা, আরো সাদা হয়। বরফ তোমার পাঁজরে হৃৎপিণ্ডে, তোমার বিবর্ণ ঠোঁটে : আমি চুমু খাই এখন কোমল কোমল : তোমার পেটে, পেটের খাঁজে যেখানে চোখ পিছলে যেত, তোমার গলায় গ্রীবায়, তোমার কানকোয়। শিরারা লাল থেকে রক্তহীন, আরো অস্পষ্ট, অস্পষ্টতর, পিস পিস হবে, পিস হবে তিনশো গ্রামে সাতটা, ব্যাগে ব্যাগে, পলিপ্যাকে।

আমি তোমায় বদলে দিলাম।

তোমার জায়গায় তোমার বদলি। সারোগেট তোমার সারোগেট মৃত্যু। তোমার তাই মৃত্যু হলনা। তোমার কোনো মৃত্যু হয়নি।

এখানে এলে তুমি আমার সঙ্গে, তুমি আর আমি আর তুমি, এখানে এই উন্মুক্ত দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপে। ছড়ানো বেলাভূমি। লাফ দিয়ে ওঠে নারকেল গাছ, ঢেউ, ঢেউ-এর উপরে লাফিয়ে ওঠে অখণ্ড অপিসকৃত মাছের রুপোলি শরীর।

মাছ কিছু বোঝেনি, অসচেতন অযন্ত্রণাবিদ্ধ মাছ, ছড়ানো সাগরের অখণ্ড সামগ্রিকতার অ্যাকোয়ারিয়ামে নৃত্যশীল মাছ, মৃত্যুশীল মাছ, বুকে বরফ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ঘুরে বেড়ায় সাগর থেকে সাগর থেকে মহাসমুদ্র, সমুদ্র একটাই, একটাই অ্যাকোয়ারিয়াম, অনেক বলে মনে হবে।

সমুদ্র জলে লাল প্রবালে প্রবালে উষ্ণ উজ্জ্বল সমুদ্র উদ্ভিদের গাঢ় লাল ফুল বেলপাতা ফুলের ভিতর নড়ছিলে, তুমি মাছকে আলিঙ্গন করো, মাছকে ধরো, আশ্লেষে, আবেগে, মাছের গ্রীবায় চুমু খাও, মুখ ডুবিয়ে দাও জলে কোমল আঁশের সাজানো ইনভাইটিং উজ্জ্বল আবেগপ্রবণতায়, মাছকে ভালোবাসো, আরো, আরো, এখনি বরফ পাবে। অনেক বরফ মাছের হৃদয়ে। ডোবাও, জিভ ডোবাও, লেহন করো, তোমার লালায়, আলজিভে, গালের ভিতর মসৃণ রোমান্সে : টের পাচ্ছো, বরফ টের পাচ্ছো?

আমি সেদিন, সেই বিকেলে, খুব নিঃসঙ্গ ছিলাম, কথা বলতে ইচ্ছে করছিল, বুলা, তোমার সঙ্গে। জিভ নেড়ে নেড়ে কথা বলতে ইচ্ছে করে, তাই আমি ফ্রিজ খুলি, দরজা খুলে নতজানু হই। এরকম নতজানু হত বিয়র্ন বর্গ, টেনিস কোর্টে, টেলিভিশনে, সেই আর্কাইকতা রয়েই যায়, নতজানু আমি ফ্রিজের শীতল শরীরে নিজের দেহ মেলে দিলাম। টুংটুং করে নড়ল সারি সারি বিয়ারের বোতল, কালো শরীর, কত বোতল, এপাশ থেকে গুণতে শুরু করলেও অনন্ত, ওপাশ থেকে গুণতে শুরু করলেও অনন্ত, অন্যরকম একটা অনন্ত, আনুভূমিক অক্ষ মোতাবেক ডানদিকের অনন্ত বা বাঁদিকের। সংখ্যারা শুধু গুলিয়ে যায়, আমি কতদিন ধরে হাঁটছি দক্ষিণসমুদ্রের এই ট্রপিকাল রোদ্দুরের বালুকাভূমিতে?

জয়ী, কারণ তোমার সঙ্গে রয়েছি, নতজানু আমি ফ্রিজের ডিটাচেবল তাকে আমার মাথাটা ঢোকাচ্ছি, ঢোকালাম। কত হাজার বছর লাগছে আমার মাথার এই যাত্রায়? আমার মাথায়, সেরিব্রাল কর্টেক্সে তোমার শৈত্য, তোমার পাউডার-কোটিং ব্রিটিশ-গ্রে চৌকো শরীরের শৈত্য, তোমার কন্ডেন্সার নিংড়ে তুমি আমায় দিচ্ছ, দিচ্ছ তুমি, তুমি কত দাও!

আমার শরীরে বহুক্ষণের নিঃসঙ্গতায় রক্তহীন, শুধু বিয়ারের অ্যালকোহলে পরিপূর্ণ, আমি তোমার শৈত্যআরাম সঙ্গের ভিতর রয়েছি। তোমার কন্ডেন্সার হার্টের একটানা গতিশব্দ, আরাম, আমায় আশ্রয় দিচ্ছে, আমি তোমার নরম জামার ভিতর। আরো ভিতরে। কত ভিতরে? উরুসন্ধিরও গভীরে?

তোমার শরীর থেকে কান্না, অবিরত প্রচুর কান্না, ঝরে পড়ছে টপ টপ টপ টপ, তুমি কথা বলতে চাইছ, পেরে উঠছ না, পারছনা কেন সোনা, এই তো পারছ, একবার দুবার পেরেছিলে, আমার স্পষ্ট মনে আছে, পারবে, এখনি পারবে, বলো, কথা বলো, তোমার হৃৎপিণ্ড যেমন বলছে, সদাসর্বদাই বলে।

তোমার কান্না টপটপ করে ঝরছে আমার মাথায় ঘাড়ে চুলে মেরুদণ্ডের ভিতর অব্দি।

আমিও কাঁদছি এখন। কেঁদে কী আরাম। মেয়েদের সিঁথিতে চিবুক রেখে নিঃশব্দে কাঁদতে আমার ভাল লাগে, আমি তোমার শরীরে অনুপ্রবিষ্ট, তুমি কাঁদছ, আমিও কাঁদছি।

ডিপ ফ্রিজের দরজা খোলা, দরজা দিয়ে ধোঁয়া বেরচ্ছে, তুমি দেখনি স্বপ্ন মানেই ধোঁয়া? প্রেম মানেই ধোঁয়া? শুধু ওড়ে, ওড়ে, সেকেন্ডে তেরোর বেশি ফ্রেমে, হয়ত ছাব্বিশে ধৃত উড়ন্ত ধোঁয়ার গতিশীলতা।

তোমার শরীরে শিরায় কৈশিক নালীতে মসৃণ প্রস্থচ্ছেদের তলে স্মার্ট তোমার শিরার রেখা, ওগুলো দেখেই ইলিশ কেনা নিয়ম, আমি মুখ চোখ ঠোঁট আরো কাছে নিয়ে গেলাম, আরো। আমার ঠোঁট মুখ রইল তোমার দেহের আশ্রয়ে। রয়েছে তারা।

একসময়, যখন আমার বিষণ্ণতা অন্তর্হিত, আমি তোমার কাছ থেকে সরে এলাম, তোমার দেহের সঙ্গে রয়ে গেল আমার ঠোঁট আর জিভ। ঠাণ্ডা ট্রের অ্যালুমিনিয়াম শরীরে সেঁটে রইল জানলার পাল্লায় নিহত শিশু টিকটিকির শরীরাংশের মত।

আমার ছিন্ন জিভ, ছিন্ন ঠোঁটের ক্ষত থেকে বিয়ার গড়িডেয় যাচ্ছে, বিয়ার গড়িয়ে যাচ্ছে, কত বিয়ার নষ্ট হয়ে গেল, সারা ঘরে দেওয়ালে টেবিলে মেঝেতে বিছানার চাদরে ক্যালেন্ডারে রাজস্থানী নারীর উরু ঘিরে বক্ররেখায় ফুলে ওঠা গাঢ় লাল ঘাগরায়।

আমার আর কোনো নিঃসঙ্গতা নেই। আমার জিভ ঠোঁট রয়েছে তোমার দেহের মধ্যে, শুধু নড়াচড়া, তিরতির করে কাঁপে মরা টিকটিকি শিশুর ছিন্ন কিন্তু জীবন্ত লেজ, শুধু কম্পন, শুধু নড়াচড়া, শুধু আশ্রয়। কোনো নিঃসঙ্গতা নেই ওদের। আমার ঠোঁট আর জিভের : আমার কোনো নিঃসঙ্গতা নেই। এখন।

ফ্রিজ, ডিপফ্রিজ, সারি সারি বিয়ারের বোতল : অবাক হয়েছিল মিহির, পড়া থামিয়ে কিছুক্ষণ কেমন গুম মেরে বসে থাকে, তারপরই খাট থেকে উঠে তাকের সামনে গিয়ে হঁরাটু গেড়ে বসে, যেমন বসার কথা — ফ্রিজের সামনে — লেখাটায় উল্লিখিত ছিল, একের পর এক বোতল তোলে। অ্যাকোয়া টাইকোটিস। ওয়াটারবেরিজ কম্পাউন্ড উইথ ক্রিয়োজোট অ্যান্ড গুয়াইকল। গুয়াইকল না গুয়াকল না গিউয়াকল না অন্য কিছু, নিজের মনে বিড়বিড় করেছিল। এরকম পরপর উল্টে উল্টে দেখেছিল সবগুলো বোতল। একটায় কিছুটা 'পূর্ববঙ্গের কাসুন্দি'। কত পুরোনে কে জানে? লেবেলটা ধুলোয় ময়লায় কালো। বেশির ভাগ বোতলে কিছুই নেই। ছোট ছোট কয়েকটা শিশি। ক্যালিফস টু হান্ড্রেড এক্স, ভর্তি শিশি একটা, একটা ফাঁকা। আরো কিছু হোমিওপ্যাথি ওষুধ। সবকটা শিশি বোতল পর্যবেক্ষণ করার পর মিহিরের কি একটু হতাশ লাগল? কিছু না কিছু মিলে যাবে এই অন্তর্তদন্তে, এটা সে ধরে নিয়েছিল?

মদ তো সারাজীবনে খেয়েছে হাতে গোনা কয়েকটা দিন। তাও কোনো অকেশানে। বিশ্বকর্মা পুজোর দিন যেমন। দু এক চুমুক না-দিলে অফিসের লোকজন এমন প্যাঁক মারে। আরো বিশ্বনাথদা, ও শালা রেগুলার খায়, ও আবার চুমুক বলেনা, বলে সিপ। তাও সে মদ খাওয়াটাও এমনই যে মদ খাওয়ার পরও তার একটুও বেখেয়াল হয়না বাড়িতে বৌছেলের জন্য একটু মাংস নিয়ে আসতে, টুকরোগুলো একটু ভাল দেখে দেওয়ার কথা হাজারিকে বলতেও খেয়াল থাকে তার।

তাও, মদ বিষয়ে এই সামান্য জ্ঞান নিয়েও মিহরের বুঝতে অসুবিধা হয়না এই বোতলগুলোর সঙ্গে লেখায় উল্লিখিত মদ্যপানের প্রসঙ্গের কোনো সম্পর্ই নেই।

তাহলে?

লেখাটাকে ঘিরে মাথায় গোপালবাবুর যে ছবিটা তৈরি হয় সেটা এত অপরিচিত লাগে তার।

যেভাবে ফ্রিজের কথা এসেছে, যেভাবে বিয়ারের প্রসঙ্গ এসেছে, যে ভঙ্গীতে, সেটা খুব অপরিচিত একটা জীবনযাপনের, তার চেনা গোপালবাবুর সঙ্গে খুব বেমানান। এমন কি হতে পারে যে গোপালবাবু সত্যিই আর একটা পরিবারে আছে কোথাও? আর একটা পরিবার মানে আসলে একটাই পরিবার। এটা, এই বাড়িটা, মিহিররা তো গোপালবাবুর পরিবার নয়। পেয়িং গেস্ট আর বাড়িওয়ালা। এতগুলো বছর ধরে, এত বছর, সেই শেষ শৈশব প্রথম কৈশোর থেকে, গোপালবাবু তার জীবনের একটা অঙ্গ। অপরিবারভুক্ততাটা বোধহয় সবসময় খেয়াল থাকেনা। মিহিরকে ছেড়ে দিলে বাড়ির অন্য তিন মানুষ সদস্যের চেয়ে বহুবছর আগে থেকে এই বাড়িটা দেখছে, ব্যবহার করছে গোপালবাবু। এই বাড়িটাকে এই বাড়িটা হয়ে উঠতেও দেখেছে। শুধু কালভার্টের পাশে ওই আমগাছ আর জমির নারকেল গাছটাই (বোধহয়) গোপালবাবুর আগে থেকে এই জমিটাকে বাড়িটাকে দেখছে। এই এত বছর ধরেই গোপালবাবুর অন্য কোথাও একটা সংসার রয়েছে? তাহলে সেখানে থাকতনা কেন? তাহলে কি ঠিক সংসার নয়, কোনো ছোটবেলার বন্ধুর বিধবা বৌ? বা, নিজেরই কোনো অবিবাহিত বা বিবাহিত মাসতুতো পিসতুতো বোন? এত বছর তার সঙ্গে এক হওয়ার সুযোগ ছিলনা, এখন এই রিটায়ারমেন্ট-প্রৌঢ়তায় এসে হয়ত তার সঙ্গে একত্র ভ্রমণে গেছে — তীর্থে। হরিদ্বার, মথুরা, কাশী, প্রয়াগ — বা, আরো দূরে — হিমালয়ে। কেদারবদ্রী, মানস সরোবর। দুজনে মিলে, একত্রে, কিছুটা অপারগ শরীর অথচ বহুবছর পরের মুক্তিতে উল্লসিত মন নিয়ে একত্রে হাঁটছে, হাঁটছে আর হাঁটছে? পাথর পথ সরাইখানায় রাত্রিবাস পেরিয়ে? নিজের ভিতরে আর্দ্র লাগে মিহিরের। এত বছর বাদে মিলে ওঠা গোপালবাবুর সেই পরিবার কি বুলা?

না, বুলা তো মরে গেছে। গোপালবাবুর এতগুলো লেখা পড়ার পর, গোপালবাবুর লেখার সঙ্গে এতটা জীবন কাটানোর পর এটা মিহিরের স্থির বিশ্বাস জন্মায় যে যে বুলা মরে গেছে। শেষ লেখার একটা জায়গায়, শুরুর দিকেই, বরফ দেওয়ার প্রসঙ্গ। বরফ দিয়ে বুলার শরীর সাদা হয়ে যাচ্ছে। বরফ তো মৃতদেহেই দেয়, যাতে পচে না-যায়। বিখ্যাত লোকদের মৃতদেহ যখন দু-তিন দিন ধরে রেখে দেওয়া হয়, বাইরের কোনো দেশে মারা গেলে বরফের পাত্রে করে দেশে ফেরত পাঠানো হয়। খবরের কাগজে চোখে পড়ে মিহিরের, মাঝে মাঝে। পাড়াতেই ডাক্তার সাধন মিত্র মারা গেল, ওর ছেলেও ডাক্তার, বিলেতে থাকে, মেয়ে ভারতেই কোথায় একটা। আসা অব্দি বরফ দিয়ে রাখা হল। মিহির অবশ্য দেখতে যায়নি। পাড়ার অনেকেই গেছিল।

গোপালবাবু কি বুলাকে দেখেছিল, বরফ দিয়ে রাখা হয়েছে, সাদা মৃতদেহ? জীবিত কালো বুলাকে মরে সাদা হয়ে যেতে দেখেছিল? বুলার গায়ের রং যে কালো সেটা লেখাতেই আছে, 'চকলেট কালো'। মানে কি তেলতেলে নরম মসৃণ একটা কালো? বর্ণনাটা পড়ার সময়েই মিহিরের খুব মনে ধরেছিল। যারা লিখতে পারে, গোপালবাবু যেমন, কেমন মাথায় আসে। মিহিরের বুলাও কালো, হয়ত সব বুলারাই কালো হয়, কিন্তু মিহির ওরকম পারত লিখতে? কেউ পারে?

আচ্ছা, সত্যিই গোপালবাবু লিখেছে ওসব? নাকি অন্য কেউ? যে মিহিরও না, গোপালবাবুও না, যার ফ্রিজ ভর্তি বিয়ারের বোতল, যারও একটা বুলা আছে, বা, বুলা ছিল, মরে গেছে। সে কলকাতার বাসে মিনিবাসে বসে থাকে, বা দাঁড়িয়ে, আর দেখে শুধু চুপচাপ চারপাশটা। চারপাশের মানুষের সঙ্গে সে কি একটা দূরত্ব বোধ করে? কখনো রাগ, কখনো তাচ্ছিল্য, আবার কখনো দূর থেকে একটা মায়া? লেখা পড়ে সেরকমই মনে হয়। আর, এই সমস্ত দেখা-গুলোকে সে লিখে চলে একজন মরে যাওয়া বুলার উদ্দেশ্যে? তার বুলা কী ভাবে মারা গেছে, বাচ্চা হতে গিয়ে, লেখা পড়ে যেমন ভেবেছিল মিহির? কিন্তু তার লেখা গোপালবাবুর খাতায় আসবে কী করে, অন্য কারোর? আর ওই হাতের লেখা গুলো গোপালবাবুরই, নিশ্চিত মিহির। খাতায় মাঝে মাঝে খরচ খরচার হিসাব পেয়েছে, গোপালবাবুর নিজের হিসাব, মাসের খরচের — সেই হিসাবে সবসময়ই একটা অঙ্ক মিহিরের চেনা, পেয়িং গেস্ট হিসাবে, দু-বেলা মিল এবং সকালের চা-বিস্কুট দিতে হয় এমন একজন এক-ঘরের ভাড়াটে হিসাবে যে অঙ্কটা গোপালবাবুর মিহিরদের প্রতি প্রদেয়। অনেক পুরোনো হিসাবে অঙ্কটা কম, যেমন আগে কম ছিল। আর, গোপালবাবু পাতার পর পাতা এমন অন্যদের লেখা টুকে রাখবেই বা কেন? কিন্তু কেন লিখত গোপালবাবু? সত্যিই ওরকম কোনো বুলা, তাকে নিয়ে গোপালবাবুর নানা চিন্তা, নানা ঘটনা, ছোটবেলা — ওসব ঘটেছিল? সেই বুলাকে একদিন ঝুলনের পাহাড় সাজাতে দেখেছিল গোপালবাবু, সেই ছোটবেলায়, যখন বুলা লাল ফ্রক পরত? বুলার বাবা কন্ট্রাক্টরি করত?

মিহিরের বুলার বাবা ঠিক কী করে, বা করত, তা মিহির জানেনা। নিশ্চয়ই ভালো কিছু করে, বাড়িটা বেশ ভালো, মেয়েকে ভালো পাত্রে বিয়ে দিয়েছে, যে ইঞ্জিনিয়র, যে অনেক গয়না এবং ভালো শাড়ি দিতে পারে তার বৌ-কে।

সেই বুলার সঙ্গে সল্টলেকের ফাঁকা এলাকায় গিয়ে প্রেম করার কথা নিশ্চয়ই ভেবে নিয়েছিল গোপালবাবু — বাস্তবে অমন কিছু ঘটতে পারেনা। আর, সেই বুলাকে ভেবে নিয়েছিল সালওয়ার-কুর্তা পরা। কেন? রাস্তায় সালওয়ার-কুর্তা পরা মেয়েদের দেখে ভালো লাগত গোপালবাবুর? উত্তেজিত হত? মিহিরও হয় মাঝে মাঝে, শুধু সালওয়ার-কুর্তায় না, শাড়ি-ব্লাউজেও হয়, ব্লাউজের পিঠ যদি খুব বেশি গোল করে কাটা থাকে, ব্লাউজের বক্র সীমারেখা জুড়ে যদি সরু লেস লাগানো থাকে, কিম্বা অর্ধস্বচ্ছ গাঢ় রঙের সিন্থেটিক শাড়িতে যদি উজ্জ্বল জরির সরু পাড় ও অলঙ্করণ থাকে — এরকম নানা কিছুতে। নারীটিকে দেখে মিহির সোজা চোখে, কখনো অন্যের বা সেই নারীটির চোখ বাঁচিয়ে, তারপর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মুখ নিচু করে নিজের হাতের দিকে তাকায়, হাতের চেটোয় : হাতের রেখায় নিজের ভাগ্য পড়ার চেষ্টা করে?

একসময়, আরো অনেকটা কম বয়সে, বেশ রাগই হত, খুব বেশি কামসৃষ্টিকারী মেয়েদের দেখলে, শরীরগুলো এক ঝলক হাওয়ার মত চোখ মাথা কপাল ছুঁয়ে চলে যায় : চলে যায় কেন? এখন যেন মনে হয় এ রাগের কোনো মানে নেই — সব নারীশরীরই আসলে এক, কোনো নারীশরীরই কখনো কামের পূর্তি ঘটায়-না, তৃপ্তি শেষ অব্দি নিজের যৌনাঙ্গেই, অনুভূতিটা শেষ অব্দি এক এবং মৌলিক, যৌনাঙ্গের শীর্ষদেশের চামড়ার আবরণীটা ওঠার এবং নেমে যাওয়ার, আর এই খুব ক্ষুদ্র মৌলিক অনুভূতিকে ঘিরে রচিত স্তরের পর স্তর যৌন কল্পনা। যৌন ক্রিয়ার চূড়ান্ত স্তরের কামের আবেশে চোখের পাতা বুজে আসে, তখন মমতাজ বা মমতা কুলকার্নি সমস্ত শরীরই নিতান্ত আপতিক। কাম, কাম আরো কাম, সমস্তটাই নিজের ভিতর। কত দীর্ঘক্ষণ ধরে নিজেকে এই আবেশে রেখে দেওয়া যায়, কত তীব্র হতে পারে এই আবেশ — সেইটাকেই কামের চূড়ান্ত বলে মনে হয়।

নিজের ভিতরে এইরকমটা মিহির মনে হইয়ে নিয়েছে তার কারণ কি এই যে ওই সমস্ত শরীর, কাঙ্খার নারীদের চর্চিত সৌন্দর্যের শরীর তার পাওয়ার নাগালের বাইরে? ইচ্ছা পরিপূরণ সম্ভব নয়, শুধু অপরিপূরিত ইচ্ছাকে অনর্থক শেষহীন বহন করে চলাই সার — এই যন্ত্রণা নিজেকে পেতে দিতে চায়না সে?

আর সেই একই যন্ত্রণার সমাধান খুঁজেছে গোপালবাবু নিজের লেখায় বুলার পোষাক খুলে সরিয়ে তার শরীরে হাত দেওয়ার ভিতর? সেই বুলা, যাকে তার পাওয়া সম্ভব নয়, যে অন্যের নারী, এবং সন্তান হতে গিয়ে যে মরে গেছে। সেই বুলার প্রেতকে তাই কি সর্বত্র দেখতে পায় গোপালবাবু, সব কিছুতে, এবং সেই প্রেতের সঙ্গে যা-খুশি-তাই করে চলতে পারে? নিজের লেখার পাতায়?

এই কথা ভাবতে ভাবতেই মিহিরের প্রথম মনে হল, গোপালবাবু পুরোটা বানায়নি তো? গল্পে যেমন বানায় গল্পলেখকেরা। বা উপন্যাসে। আর গল্পলেখকেরা, উপন্যাস-লেখকরা চরিত্র খুঁজে পায় তাদের চারদিক থেকেই। অনেকদিন আগে শারদীয় নবকল্লোলে একটা উপন্যাস পড়েছিল মিহির, উপন্যাসই বোধহয়, বিমল করের লেখা। বিমল করের লেখা গল্পের সিনেমা দেখেছে মিহির, 'সাহেব বিবি গোলাম', হিন্দিটাও দেখেছে। কিন্তু লেখা পড়েছে ওই একটাই। সেই লেখাতে ছিল, বিমল কর কেমন লক্ষ্ণৌ গেলেন কী একটা কাজে, কেন জানি থাকতে হল সেখানে, তার পর একজন বৃদ্ধ টাঙা-চালকের সঙ্গে আলাপ হল, তার জীবনের ঘটনা, উপন্যাসেও সেই ঘটনাগুলোই লিখলেন। এই টাঙা-চালক সেই উপন্যাসে একজন বড়লোকের ছেলের ব্যক্তিগত ভৃত্য, নিজের জীবনে টাঙা-চালক হওয়ার আগে সত্যিই সে যা ছিল।

গোপালবাবুও কি সেই রকম তার চারপাশ থেকেই চরিত্র খুঁজেছেন, একজন গল্পলেখকের মত? এমনটা কি হতে পারে যে মিহিরের বুলাকেই দেখেছিলেন গোপালবাবু, এই কাছেই তো বাড়ি, কোনো একটা অজানা রকমে তার প্রতি মিহিরের

অনুভূতিটাও আন্দাজ করে নিয়েছিলেন, বা, হয়ত কল্পনা করে নিয়েছিলেন। তার পর মিহিরের জবানিতেই লিখেছেন গল্পটা। মিহির যেমন ভাবে। বা, ভাবতেও পারে। ভাবলেও ভাবতে পারে।

কিন্তু সে তো ওভাবে ভাবে না। নাকি, ভাবে? কিরকম এলোমেলো হয়ে যেতে থাকে মিহিরের। এমনটা কি হতে পারে যে মানুষ ওভাবেই ভাবে, কিন্তু নিজেই টের পেয়ে ওঠেনা?

তা যদি নাও হয়, বুলাকে জেনে বুলাকে লেখেননি গোপালবাবু, নামটা নিতান্তই একটা সমাপতন, তাহলেও এই লেখাটা কি আসলে একটা উপন্যাস? যে উপন্যাসটা লিখতে লিখতে গোপালবাবু, ঠিক বুলার শরীরে হাত দেওয়ার মতই, নিজের সমস্ত ইচ্ছার পরিপূরণ ঘটাচ্ছেন? ঠিক মিহিরের যেমন বুলার স্বামীর উপর, সংসারের উপর, সফল স্বামীসংসারে সসন্তান সালঙ্কারা জীবনযাপনের উপর একটা রাগ হয়, তেমনি গোপালবাবুরও হয় তার না-পেয়ে-ওঠা নারীদের উপর? তাই তাদের মেরে ফেলছেন? আবার ফেলছেনও না। তাদের নিয়ে যাচ্ছেন 'দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপে', তার পর তাদের সঙ্গে একত্র জীবনযাপন করছেন, যেখানে ঘর নেই, শুধু হেঁটে চলবার জ্যোৎস্না আর বালি আর ঢেউ-উঠতে-থাকা সমুদ্র, যেখানে চাকরি নেই, এসবিএসটিসির বা ব্যাঙ্কের, ভাত খেয়ে উঠেই খুঁটে খুঁটে এঁটো ভাত থালায় তুলে ফেলা নেই, সবসময়ই অন্য সকলের মত জীবন কাটিয়ে চলার দায় নেই।

এই সময় মিহিরের গোপালবাবুকে বেশ আপন লাগে। নিজের লাগে, অনেকটা যেন নিজেরই মত বলে মনে হয়, চেনা লাগে। গোপালবাবুর কত পড়াশুনো : ওই রাশি রাশি বই, তক্তাপোষের নিচে, তাকে, মেঝের উপর কাঠের তক্তা আর কাগজ পেতে থাক থাক করে রাখা। বৌ-এর কাছে শুনে একদিন অবাক হয়েছিল মিহির, ওই বইয়ের থাকগুলো বৌ-ই গুছিয়ে দিয়েছে। গোপালবাবুর ঘরের ভিতরটা ঠিক কেমন দেখতে এই এত বছরে কখনো ভালো করে জানতে পারেনি মিহির, আর বৌ সেখানে ঢোকে, বই গুছিয়ে দেয়, তখন নিশ্চয়ই গোপালবাবুর সঙ্গে কম হোক বেশি হোক কথা বলে বৌ। কী কথা বলে? মিহির জানে, এই প্রশ্নটা বৌকে করার কোনো মানেই হবেনা। বৌ হেসে ফেলবে। 'কী কথা আবার — তুমিও যেমন', একটু মজায় অবাক তাকিয়ে থাকবে। এই মজায়, অবাকে, বৌ তাকিয়ে আছে, তাকিয়ে থাকছে — এই দৃষ্টিটাকে ভীষণ ভয় পায় মিহির। কী কথা বলবে, কী করবে, বুঝে উঠতে পারেনা। বৌ-এর আচরণে তেমন কোনো আক্রমণ নেই, অফিসে বা অন্য কোথাও অন্য অনেকেরই যেমন, নিজেকে যে গুটিয়ে নেবে, বা, কখনো ম্লান হেসে চোখের দৃষ্টিকে মাটির সঙ্গে সমান্তরাল করে দেবে — কী করতে হয় ওরকম ক্ষেত্রে তা সে জানে। কখনো কখনো, তেমনটাও মাঝে মাঝে তার জীবনে ঘটে বৈকি, ছিটকে পালিয়ে যেতে হয়, যেন তাকে অতর্কিতে কামড়ে দিল কোনো সাপ বা বিছে, তার পর একা একা রাস্তা দিয়ে হাঁটে, একা আর ল্যাম্পপোস্ট, আর চলে যেতে থাকা গাড়ির আলো, চোখে জলও আসে কখনো, কেন এমনটা করে মানুষ, সে তো কারুর কোনো লেজ মাড়িয়ে দেয়নি। তার পর, হাঁটতে হাঁটতে একটা সময়ে মনে আসে, এরকমই হওয়ার কথা, ছোটবেলা থেকে দেখে আসছে, এটাই নিয়ম। নিয়ম কে বানায় কেন বানায় তা সে জানেনা, কিন্তু এটাই নিয়ম। এরকমই করে সবাই। এই ভেবে নিতে নিতেই মাথায় একটা মুক্তি আসে, এক রকম আরাম। এই 'সবাই' শব্দটাই সেই মুক্তির উৎস, ভেবে দেখেছে মিহির। সবাই মানেই অন্য সবাই, সে আর অন্যরা, তাই 'সবাই' বললেই সে একটা ভিড়ে ঠাসা ইউনিয়নের মিটিং-এ ঘরের একদম কোণের একটা সিটে চলে গেল, পেছনদিকের কোণে, ডানপাশে দেওয়ালে সস্তা চুনকামে ড্যাম্প ফুটে ফুটে ছবি, ছবি আর ছবি, কত ছবি কত রকমের, ঋতু থেকে ঋতুতে বদলায়, শান্ত নিবিড় স্থির মনোযোগ নেতাদের বক্তৃতা শোনে মিহির, বক্তৃতা শোনা আর ঋতু বদলের ছবি দেখা, আর অন্য সবাইকেও দেখতে থাকা ভ্রাম্যমান চোখে। দেখতে দেখতে সে অপমান দুঃখ আক্রমণের ওপারে চলে যেতে পারে।

ভালোবাসায় স্নেহে বৌ-এর একটু অবাক চোখ, যেন তার সামনে মিহির নয়, তার দুধের বাচ্চা, সেই বাচ্চা প্রথম দাঁড়াল যেন এইমাত্র : কত নাটক কত তুমুল সংগ্রামে, মিহিরকে ভয় পাইয়ে দেয়। কী বলবে বুঝে উঠতে না-পারার ভয়, বিশ্বাসঘাতকতার ভয়। এই নারীটির জীবন তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল। নারীটিকে তার জীবনে যা কিছু পাবার, গোটা জীবনে যত কিছু করার, তার সমস্ত প্রত্যেকটি কিছুই মিহিরের, একমাত্র মিহিরের সঙ্গেই পেতে বা করতে হবে : মিহিরের ভয় লাগে, দেওয়ালে পিঠ দিয়ে বসে পড়তে ইচ্ছে করে। এই নারীটি নিজের জীবনের কথা ভাবে কখনো? ভাবতে গেলে কি শুধু শুকনো নারকেলের মালার স্তূপের কথা মনে হয় তার? বা, জং-পড়ে যাওয়া লোহার কড়াইয়ে ঘষে ঘষে রোজ জং তোলার কথা? সেই ভাবনা মাথায় এলে বৌ-ও কি দাঁতে দাঁত চেপে তখন রান্নার ফোড়নের কথা ভাবে, দোকানের তথা গৃহেরও কর্মচারী গণেশ ছেলেটিকে বড় বাজারে দড়ি কিনে আনতে পাঠানোর কথা ভাবে? জানে, নইলে মাথাটা বড় শূন্য লাগবে একটু পরেই, টাল খাবে যেন। আর, সেই সমস্ত দায়ই কি মিহিরে এসে বর্তায় না? কারণ, মিহিরের কাছ থেকেই বৌ-এর পাওয়ার কথা ছিল, জীবন থেকে যা পাওয়ার। কী? তা মিহির জানেনা। বৌ-ও কি জানে? কিন্তু, কার কাছ থেকে পাওয়া যায়নি সেটা জানে। না-জানলেও তার কারণ জোর করে নিজেকে সেটা জানতে দেয়না। কখনো বৌ-তো তাকে আক্রমণ করেনা, অকারণ অপমান করেনা, অন্য অনেকেরই মত, অথচ বৌ তা করতেই পারত। বরং সস্নেহে হাসে। মিহিরের ক্রোধ হয়, তীব্র ক্রোধ। যৌনতার সময়ে যা ঘটেছিল, সেটা আপতিক নয়, বোঝে মিহির, বৌ আসলে তার, মিহিরেরও মা, বেশ ভালো মা, দিনকে দিন মা থেকে আরো মা হয়ে ওঠে। সহনশীল, ধৈর্যশীল নিরূপা রায় মা।

তাই বৌ-কেও 'অন্য সবাই' ভেবে নিতে পারেনা মিহির। পারেনা। আবার নিজের ভিতরে কি এই কথা ভেবে নিয়েছে মিহির যে নিজে ছাড়া অন্য যে-কেউই 'অন্য সবাই' হতে বাধ্য? তাই তার ক্রোধ হয়। যে 'অন্য সবাই' নিজের অন্যতাকে গোপন করছে, আর তার ব্যবহারবিধি, চিন্তাপ্রক্রিয়াকে এলোমেলো করে দিচ্ছে। তাকে দায় না-পালনের, অক্ষমতার, অসহায়তার যন্ত্রণায় ঠেলে দিচ্ছে। এর চেয়ে বৌ যদি ভয়ঙ্কর হত, অত্যাচারী হত, কোনো মায়ামমতার লেশ না-রাখত নিজের প্রকরণে, সেটাই কি সুবিধার হত মিহিরের পক্ষে? সে জানে, সে তার নিজের কথাগুলোকে বৌ-এর কাছে বলে-উঠতে বুঝিয়ে-উঠতে পৌঁছিয়ে-দিতে পারেনা। যেমন অন্য সবাইকেও পারেনা। গোপালবাবুও পারেনি। অত পড়াশুনো, অঙ্ক বিজ্ঞান সাহিত্য সবকিছু নিয়ে পাতার পর পাতা ওই অজস্র লেখাপড়ার পরও। গোপালবাবুকে তাই ওই লেখা লিখতে হয়েছে, যেন বুলাকে, ওই পাগলামির লেখা। আর গোপালবাবু তো জানত-না, একজন লোকও ওই লেখা পড়বে। জানত-না যে, নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া, হঠাৎ কোথাও কোনো সূত্র না-রেখে উধাও হয়ে যাওয়া গোপালবাবুর কোনো সূত্রের খোঁজে, অন্তত ঘোষিত ভাবে সেটাই তো সত্যি, কৌতূহলটা নয়, মিহির এই ঘরে ঢুকবে। দিনের পর দিন পড়ে চলবে। সেই স্তূপ স্তূপ খাতার ভিতর গাদা গাদা দুর্বোধ্য, মিহিরের পক্ষে সম্পূর্ণ অবোধ্য লেখাপড়ার ভিতর থেকে খুঁজে খুঁজে বুলার লেখাগুলোকে মিহির বার করবে, পড়েই চলবে, কারণ, তার নিজেরও একটা বুলা আছে, এটা আগাম গোপালবাবুর পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কী করে সম্ভব?

বিশ্বপৃথিবী নিয়ে, জীবন নিয়ে, সাহিত্য নিয়ে অনেক জটিল জটিল ভাবনার চিহ্ন বহন করছে ওই খাতাগুলোই। বরং সেসব যারা জানে তাদের পক্ষে ওগুলো বোঝা সম্ভব। কিন্তু তার বাইরে, সমস্ত বিষয়ের বাইরে, কাউকেই বোঝানো যায়না এমন অনেক কথাও থাকে মানুষের, লেখাপড়ার বাইরে, পড়াশুনোর বাইরে, শুধু নিজের কথা। সেই সব কথা বলে উঠতে না-পারার যন্ত্রণা গোপালবাবুকে উগরে দিতে হয়েছিল বুলার লেখায়। সেরকম কথা মিহিরেরও আছে, গোপালবাবুর মত, সবারই থাকে।

মিহিরের বৌ মিহিরের সেই সব কথার শ্রোতা নয়। কেউই নয়। কেউই থাকেনা এই কথার শ্রোতা। প্রত্যেকেই শুধু কথক। অন্যের মনের এইসব কথা শোনার সময়েও মানুষ আসলে বোঝেনা, নিজের মনের কথাই খুঁজে পায়, নিজের মত করেই বানিয়ে বেঁকিয়ে নেয়। যেমন গোপালবাবুর লেখাতেও মিহির শুধু তার নিজের বুলাকেই খুঁজে পাচ্ছে।

বৌ তার এই কথার শ্রোতা নয়, আবার তার, মিহিরের অন্য সহজ কথার তলায় গোপনে গোপনে, এরকম অনেক না-বলা কথা রয়ে যায় বলে তাকে ঘেন্নাও করেনা, অন্য অনেকের মত। বৌ একটা অস্তিত্ব, যার সঙ্গে নিজের সম্পর্কটাকে নিজের কাছে কিছুতেই স্পষ্ট করে তুলতে পারেনা মিহির, শুধু আরো আরো এলোমেলো বাতাসের ভিতর চলে যায়। বৌ একটা নারীশরীর, বছরের পর বছর, সেই কৈশোর থেকে যাকে স্বপ্ন দেখে এসেছে মিহির। নগ্ন করে, পোষাক খুলে, প্রত্যেকটা ইঞ্চি জায়গায় হাত দিয়ে মুখ দিয়ে যৌনাঙ্গ দিয়ে যন্ত্রণা দিয়ে খেলা করে রক্তাক্ত করে ডুবে গিয়ে ভুলে গিয়ে সে দেখবে, দেখার সম্পূর্ণ অধিকার আছে তার এমন একটা নারীশরীর। তারপর, তারপর, সমস্ত কিছু হয়ে যাওয়ার পর কী মিলবে — সেই সমস্ত তখন দেখত-না মিহির। অনেক ভেবে মিলিয়ে দেখেছে মিহির, বৌয়ের শরীর সম্পূর্ণ উলঙ্গ দেখলেই একটা যাদু সৃষ্টি হয়, যা শুধু যৌনতার নয়, আরো কিছুর। সেই আরো কিছুটা খুঁজে চলাটা কি তার পক্ষে আরো সহজ হত, যদি বৌ-কে অন্য সবাইয়ের ভিতর ঠেলে দিয়ে, ভুলে গিয়ে সে থাকতে পারত?

আসলে এটাই নিজের কাছে বৌ-কে মেরে ফেলা? এই ভুলে-যেতে-পারাটা? বৌ-এর মৃতদেহ নিয়ে বেঁচে থাকা, বৌ-এর মৃতদেহের সঙ্গে সঙ্গম করা? জীবনযাপন করা মানে তো আসলে বৌ-এর সঙ্গে সঙ্গম করা নয়। বৌ-কে পেরিয়ে যেতে পেরে অন্য কিছুকে খুঁজে উঠতে পারা।

গোপালবাবুও সেই একই কারণে বুলাকে মেরে ফেলে? তারপরও শুধু বুলার মৃতদেহের সঙ্গে থাকে? বুলার মৃতদেহের বুকে মুখ দেয়, বিছে বেরিয়ে আসে জিভের উপর, যেমন একদিন মায়ের স্তন থেকে দুধ বেরিয়েছিল : জীবন, জীবন চারিয়ে গেছিল শরীরে শরীরে, সমস্ত শরীরে। বুলাকে মেরে ফেলা মানে সেই মা-কে মেরে ফেলা? তারপর মা-কে পেরিয়ে খুঁজতে পারা?

> এখন এই দ্বীপের উপর শনশন হাওয়া। পাতাকে তুলে নেয় শুকনো পাথর মাটি বালির উপর থেকে ঘূর্ণীর নাভিতে চড়িয়ে, পাতারা ওড়ে, উপরে, আরো উপরে, আরো।
>
> একসময় পাতারা নিজেরাই ওড়ে।
>
> বায়ুমণ্ডল পেরিয়ে শূন্যতায় মহাশূন্যতায়। শুকনো পাতারা একদিন ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করে চলে গেল।
>
> পাতার কোনো দায় নেই, পল্লব বা ভূর্জ বা প্যাপিরাস, পাতার কাউকে জন্ম দিতে হয়না, ফিরে আসতে হয়না, জন্ম দেবে বলে। পাতারা কোথায় যায় : ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে, কোথায়? কোথায়? কোন স্থানে? স্থানই তো থাকেনা আর, ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে কোনো স্থান কাল নেই। এত পাতা কোথায় গেল?
>
> কোথাও যায়নি। আমার চারপাশে একটা বিশুষ্ক মণ্ডের মত। আমি ডুবে যাচ্ছি শুকনো পাতার ভিতর, আমার চারপাশে একটা ঘন শুকনো স্মৃতিময়তা। পাতার পর পাতা। আমি হাত নাড়ছি পা নাড়ছি। আমার হাত আমার পা আমি উপরে যাই, যত উপরেই যাই, আরো আরো শুকনো পাতা : ভূখণ্ড ও গাছ সৃষ্টির সেই প্রথম দিন থেকে

তার চেয়ে দ্বীপের কথা হোক। দ্বীপের ভিতর যেমন থাকছি আমরা, দ্বীপের উপর। তুমি তোমার যোজন বিস্তৃত মসৃণ মৃত্যুসাদা নিবিড় পোষাক ছড়িয়ে জলের উপর হাঁটছো, আমি জলের নিচে সাঁতার কাটছি, তোমায় খুঁজি, পাথরের ভিতর, জলের ভিতর, মাছের শরীরে।

তুমি মেঘ হয়েছিলে। বুলা, তুমি জল হও। জল থেকে মেঘ থেকে জল, আমি জল নিয়ে খেলা করছি। আমি জল নিয়ে খেলা করছি। আমি তোমায় দুই করপুটে নিলাম, ছুঁড়ে দিচ্ছি আকাশে। জলেরা ফিরে আসে, সাগরে ফিরে আসে জল, মাছ, মৃতদেহ।

আমি মৃতদেহের কথা বললাম? এই মাত্র? লিখলাম? কেন? কেন?

না, না, আমি কোনো মৃতদেহকে চিনিনা।

এই যে আঙুল, আঙুলের মাথায় ধরা পেন, পোকার মত এঁকে বেঁকে নড়ছে, বেঁচে আছে, আমি, আমার হাত পা মুখ চুল দীর্ঘশ্বাস ক্ষয়ে যাওয়া, আমি মৃতদেহ নই, আমি জানি, নিশ্চিত, আমি জানি আমি মৃতদেহ নই। তাহলে কে? কে মৃতদেহ? বুলা?

না বুলা, তুমি হাঁটছ, জলের উপর দিয়ে, তোমার গোড়ালি জলে ডুবে আছে। তুমি মৃতদেহ নও বুলা, তুমি নও, তোমার কোনো খণ্ডই মৃতদেহ নয়। প্রতি প্রতিটি খণ্ডই রাখা আছে, তাদের উপরে ভোরের আলো আর শিশির, সকালের নতুন টগরফুল ঝরছে মুখের চারপাশে। সব, সমস্ত খণ্ড, তুমি বুলা তোমার সমগ্রতায় আছো, শুধু তোমার একটা শরীর অনেক শরীর হয়ে গেছে। যখন আরো খণ্ড, আরো ছোট, আরো ক্ষুদ্র, অণু পরমাণু আরো দূর দূর অব্দি তুমি ছড়িয়ে যাচ্ছ হিমালয়ের বরফ উপত্যকায়, রাতচর প্যাঁচার পালকে আর দমকলের ঘন্টার শব্দে, তখনো আমি তোমায় দেখছি, নিঃশব্দ আমি চেয়ে আছি। আমি এখন নিঃশব্দে থাকি, শুধু তোমার সঙ্গে কথা নির্বাকতা শুধু তোমার সঙ্গে, আমার ঠোঁট আর জিভ তোমার শরীরে রয়ে গেল।

আমার টুকরো জিভটা গোলাপি, কর্তনের জায়গাটা কালচে লাল। বিয়ার বা রক্ত শুকিয়ে গেলে যেমন দাগ হওয়ার কথা। আমার জিভটা তোমার সঙ্গে আছে। আমার ঠোঁট। তাই আমার ঠোঁটের জায়গায় হাড় আর দাঁতের মূল দেখা যায় আমার প্রতিবিম্বে।

বালিতটে থাকা মানেই, সমুদ্রে যখন ঢেউ নেই, খাঁড়িতে, তখন শুধু নিজের হাড় আর দাঁতের সামনে দাঁড়াও। এখন আমার কোনো প্রতিবিম্ব নেই, জলের নিচে। জলের নিচেই থাকি আজকাল। মাঝে মাঝেই। প্রবাল আর মাছের ঋতুচক্র আর মৃত মাছের হাড়আঁশ স্বপ্নের সঙ্গে।

একটা বর্ষাকাল থেকে আর একটা বর্ষাকাল আমি প্রায়ই থেকে যাই জলের নিচে। জলের নিচে কোনো বর্ষা হয়না। আমার শরীর ভারহীন থাকে। চুলেরা অনুত্তাপ শিখায় জ্বলতে থাকে মাথার উপরে। চোখের খোলা মণিতে মুখ রেখে চলে যায় সমুদ্র-শামুক, এত শান্ত থাকি আমি। সমুদ্র-পোকারা আমার চোখে বাসা করেছে। চোখটা স্থির হয়ে গেছে। নড়েনা। চোখটা নেই আর, পোকারা বড় তাড়াতাড়ি খায়, শুধু দৃষ্টিটা রয়েছে, ছড়িয়ে থাকা টেন্টাক্লের মত। আমার চারপাশে জলের ভিতর নড়ে, ঘুরে বেড়ায় আমার দৃষ্টি। আমার দৃষ্টি আমার শরীর থেকে অনেক দূরে সন্তানবতী ডলফিনের পেটে কোনো ছেদ না-করে হাঙরকে ডলফিন-শাবক খেয়ে যেতে দেখল, হাঙরের দাঁত এত মসৃণ। ডলফিন-মা অনন্ত সন্তানবতী হয়ে গেল। তার এই সন্তান আর কোনোদিনই জন্মাবে না, যে সন্তান নেই সে আর জন্মাবে কী করে, অনন্তকাল সে শুধু সন্তানকে বহন করে চলবে, কী আরাম, গর্ভের কী আরাম, আর পেটেরও কোনো ভার নেই, জল সব লাঘব করে, প্রসবের কোনো বেদনার দায় নেই, শুধু সন্তানের অনুভূতি পেটময়, ডলফিন-মা তার শূন্য কিন্তু স্ফীত পেট নিয়ে ঘোরে চারপাশে, প্রায়ই দেখি।

শুধু পর পর এই দুটো লেখাতেই নয়, এর পরের লেখাটাতেও এল কিছু পুনরাবৃত্ত প্রসঙ্গ। নোনাজল হাঙর ডলফিন।

গোপালবাবুর ঘরে চুপচাপ বসে আছে মিহির। অফিস থেকে ফিরেই, মুখ হাত পাও ধোয়নি, জামাকাপড়ও ছাড়েনি। অফিসেও সারাদিন আজ মনটা কেমন উচাটন করছিল, প্রায় রোজই ওরকম করে আজকাল, এই গোপালবাবুর ঘরটা হওয়ার পর থেকে, এর সঙ্গেই বেঁচে থাকতে শিখছে।

ফিরে এসেই দেখল বৌ নেই, মনে পড়ল, আগেই বলেছিল, সকালে, টিভিতে সিনেমা দেখতে যাবে, কেব্‌ল টিভিতে, টুকুদের বাড়ি। ওর দাদা কেব্‌ল টিভির মেম্বার হয়েছে, তাতে আজ সন্ধ্যায় ফুলনদেবীকে নিয়ে একটা সিনেমা দেখাবে — নতুন সিনেমা। সকালে খুব উত্তেজিত গলায় বলতে শুনেছিল, বৌ-কে বলছিল।

দোকানের ছেলেটাকে বলে গেছিল বৌ, মুড়ি আর চা দিতে। বারণ করল মিহির। পেটে একটু খিদেও আছে। তবু, এটা একটা আরাম — এই যে বাড়িতে কেউ নেই, গোপালবাবুর ঘরে সে কতক্ষণ কাটাচ্ছে তার উপর প্রহরা রাখার মত কেউও নেই। ছোটটা তো কোলে, বড় ছেলেটাও গেছে সঙ্গে। সিনেমাটা ওর দেখা ঠিক হচ্ছে কি? এই সিনেমাটা নিয়েই কি খবরের কাগজে সে কিছু একটা পড়েছিল? কিছু দৃশ্য নিয়ে আপত্তি — এই সব? যাকগে, বৌ হয়ত ওই সময় ছেলেটাকে বলবে চোখ বন্ধ করে থাকতে। আর দেখলেই বা কী? কী এসে যায়?

বাড়িতে কেউ নেই, পেছনের দোকানে ছেলেটা চুপচাপ বসে আছে, কটাই বা আর খদ্দের আসে, একটা নৈঃশব্দ্য, গোপালবাবুর ঘরে বসে থাকে মিহির। কোলে একটা খাতা, পাশে দু-তিনটে ছড়ানো। চুপচাপ। একা। একটা স্বস্তি — কোনো দিকে কোনো

মনোযোগ দিতে না-হওয়ার। নিজেদের পুরোনো সাদা-কালো টিভিটা যে খারাপ হয়ে আছে এজন্যে এখন একটা ভালো-লাগা তৈরি হয়।

গোপালবাবুর লেখার টুকরোগুলো, যেগুলো পড়া হয়েছে, সেই খাতাগুলো একসঙ্গে রাখা গোপালবাবুর গুটিয়ে রাখা বিছানার ধারে, ছেঁড়া ছেঁড়া অবিস্রস্ত রকমে, মাথায় আসে মিহিরের সেই খাতাগুলোর কথা।

কতকগুলো টুকরো, কিছু উচ্ছ্বাস, কিছু ছেঁড়া ছেঁড়া কথা, কিছু পুনরাবৃত্ত প্রসঙ্গ। সবগুলো লেখা মিলে কি একটা লেখা? নাকি আলাদা আলাদা? কিছু কিছু মিল থাকে, আবার অন্য কিছু একদম আলাদা, সবসময় একই লেখার টুকরো বলে ভাবাও যায়না। পরেরটাও তাই।

> রক্তচক্ষু গলে গলে পড়ে, সেখানে কোনো শব্দ ছিলনা, আমি গাছ দেখি। আমার কোটর শূন্য, চোখের কোটর শূন্য। পাখির শাবক তার শব্দ নিয়ে শূন্যে মিলিয়ে গেছে।
>
> আমরা প্রত্যেকে হাত খসাই পা খসাই, আমাদের হাত পা নখ ও দাঁত আমাদের স্মৃতি। একদিন বিকেলবেলায় তোমাকে দেখলাম, বুলা, আমি তোমার সামনে দাঁড়াই। আমায় চিনতে পারছ? আমার হাত ছিল, পা ছিল, নখ ও দাঁত ছিল, শূন্য কোটরে চোখ ছিল, শূন্য ক্ষেতে ফসল ছিল, ফসলে হাওয়া বয়ে শব্দ হয়, সরসর ঝরঝর সরসর, শব্দের স্মৃতি
>
> এখানে তোমার সামনে সমস্ত আলো এসে প্রার্থী, সমস্ত কুকুর তাদের মধ্যরাত্রিকে পরিত্যাগ করে যাচ্ছে তোমার সামনে, শুধু দিনের আলোতেই এখন থেকে কুকুরদের দেখা যায়, শুধু কুকুরদের দেখা যায়, শুধু কুকুর
>
> আমি হাঁটছি, তোমার নির্মোক মোচন করো
>
> তোমার আবরণ খোলো, হে শষ্যশ্যামলা, তোমার আনত বুকে আমি স্বচ্ছ দেখি সমস্ত শব্দ
>
> তোমার মাথার পাশে পাখি উড়ে যাচ্ছিল, আমি পাখি দেখে ভয় পেলাম কেন? আমার কি বজ্রপাতের কথা মনে পড়ল? আমি এখানে অনেকদিন হল একটা পরিখা খুঁড়েছি, পরিখা খুঁড়তে খুঁড়তে সাগর নোনাজল হাঙর আর ডলফিন
>
> ডলফিন খুব ভালো লাগে।
>
> তুমি আমার হাতের মধ্যে এসো, আমার হাতে, আমার রক্তে মিশে যাও, তোমায় আমি ছুঁয়েছি, আমার শরীরে বিদ্যুৎপ্রবাহ হল, তুমি বসে থাকছ, আমার শিরাউপশিরা তাদের তন্তুজাল খুলে ছড়িয়ে যাচ্ছে, আমার স্নায়ু, চারপাশে
>
> তুমি কই? আমি আমাকে দেখতে পাচ্ছিনা। আমার মাথার পিছনদিকটা, আমার ঘাড়, আমার পিঠ আমি দেখতে পাচ্ছিনা, আমার মাথার চারদিকে চোখ হল, তখনো আমি আমার চোখগুলোকে দেখতে পাচ্ছিনা, আমার দৃষ্টিকে : আমাকে। আমার চোখ আমার শরীর থেকে বাইরে গেল বিচ্ছিন্ন। আমাকে দেখতে পাচ্ছি। আমাকে দেখতে পাচ্ছি? আমাকে? তোমাকে দেখতে পাচ্ছি?

এই লেখাটার শেষে, নিচেই একটা পেনের আঁচড়, যেন আরো কিছু লেখার কথা ভেবেছিলেন, তারপর আর লেখেননি। কী লিখবেন সেটা কি গোপালবাবু ঠিক করে উঠতে পারছিলেন না?

এই লেখাগুলোয় গোপালবাবুর হাতের লেখা, পড়াশুনোর বিষয়ে গোপালবাবুর শান্ত লেখাগুলোর থেকে অন্যরকম। কোনো কোনো জায়গায়, লেখাগুলোর ভিতরে, গোপালবাবুর পেন যেন কোনোক্রমে কাগজ ছুঁয়ে চলে গেছে, অনেক অক্ষরও খুব অস্পষ্ট। দেখলেই মনে হয় গোপালবাবু একটা ঘোরের ভিতরে লিখেছিলেন। একটা উদ্বিগ্নতা, একটা টেনশন, লেখাগুলো কোথাও একটা গজাচ্ছে, তার মাথার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে — তার একটা শব্দও যেন হারিয়ে না-যায় — সত্যিই কি এভাবে লিখেছিলেন গোপালবাবু, না মিহির অমন ভেবে নেয়?

ঘোরগ্রস্ততার এই এলোমেলোপনা মোট লেখাগুলোকে মিলিয়েও। কিছু কথা বারবার ফিরে ফিরে আসছে। যেমন চোখ, দৃষ্টি, চোখের কোটর প্রায় প্রতিটা লেখাতেই আছে — গোপালবাবু কী বলতে চাইছিলেন? লেখাগুলো মিলিয়ে গোপালবাবু বোধহয় কোথাও একটা পৌঁছতে চেয়েছিলেন, কিছুতেই যেখানে পৌঁছতে পারছিলেন না। বুলার সঙ্গে, বুলাকে, কথা বলতে বলতে, লিখতে লিখতে, মোটের উপর কিছু একটা বোধহয় বলে ফেলতে চাইছিলেন, সব লেখাগুলোকে মিলিয়ে যেটা বেরিয়ে আসবে।

একটা বড় লেখা খুঁজে পেল মিহির। যেটা কখনো এক দিনে বা এক সঙ্গে বসে লেখা নয়, সেটা লেখা থেকেই বোঝা যাচ্ছে। একই কাগজে একই পেনে একই জায়গায় বসে লিখলেও সেটা বোঝা যায়। আলাদা দুটো দিনের লেখার ছবি কিছুতেই ঠিক একই রকম হয়না। এক দিনের একটা ধরণ, চলতে চলতে হঠাৎ সেটা বদলে গেল, দাগটা হয়ত সামান্য বেশি গাঢ়, বা অক্ষরগুলো একটু বেশি চওড়া চওড়া, বা নতুন লিখতে বসে অক্ষরগুলো একটু বেশি স্পষ্ট আর সুন্দর, এরকম কিছু একটা এবং বোঝা গেল আর এক দিনের লেখা শুরু হচ্ছে, আগের দিনের লেখাটা শেষ হল।

এই বড় লেখাটার টুকরোগুলো মিলিয়ে গোপালবাবু কি একটা গল্প তৈরি করতে চাইছিলেন? ওই আর কী — গল্প বা উপন্যাস। কেমন একটা গল্প গল্প ধরণ এই বড় লেখাটায়। এটার আবার অংশ ভাগ করা ১, ২, ৩ করে। একটা খাতায় প্রথম কিছু পাতা জুড়ে শুধু এই লেখাটাই। তারপর অনেক সাদা পাতা। শেষেও একটা ৮ নম্বর অংশ শুরু করার মত পাশে একটা ৮ লেখা, কিন্তু তারপর কোনো লেখা নেই।

গোপালবাবু কি আরো কিছু লিখবেন বলে ভেবেছিলেন? পরে আর লেখেননি? কেন? কবে এটা? কতদিন আগে? বহুবছর না অল্পদিন? মিহিরের সেই ছোটবেলায়, না, উধাও হয়ে যাওয়ার কদিন আগেই? কেন শেষ করেননি লেখাটা? সময়ের অভাবে? নাকি লেখাটা ওর খারাপ লাগছিল? মনোমত কোনো শেষ পাচ্ছিলেন না? এটার কোনো শেষ নেই, তাহলে এটাই কি গোপালবাবুর শেষ লেখা? এই এত খাতাভর্তি পাতার পর পাতা লেখা, যা জেনে-হোক আর না-জেনে-হোক তিনি রেখে গেছেন মিহিরের জন্যে, মিহির অফিস থেকে ফিরে, অফিস যাওয়ার আগে, এমন বসে থাকবে বলে, সেই মোট লেখায় শেষ সংযোজন এই লেখাটাই? মিহির একটু উত্তেজিত হয়। তাহলে এই লেখাটার শুরুতেই, খাতা শুরুর প্রথম ডানদিকের পাতা ছেড়ে দিয়ে দ্বিতীয় ডানদিকের পাতায় লেখা 'বুলা, তোমাকে'। গোটা গোটা বড় অক্ষরে। একবার লিখে আর একবার পেন বোলানো হয়েছে, দেখেই বোঝা যায়। বাঁধানো ছয় নম্বর খাতা, রুলটানা, কম্পানির নাম 'রাইটার', খাতার দোকানে জিগেশ করেও কোনো হদিশ পায়নি মিহির কবেকার খাতা এটা। কম্পানিটা বহু আগে উঠে গেছে এরকম হলে যেটা পেতে পারত।

লেখাটায় প্রচুর কাটাকুটি। মিহিরকে পড়তে হয় থেমে থেমে। বহু জায়গায় খুব ঠিক পড়ছে কিনা এই বিষয়েও নিশ্চিত হতে পারেনা।

১।। তুমি তাকালে? দেখছ? আমি যা দেখি তুমি তা দেখো? আমি দেখি কালো রং : ঘনসংবদ্ধতা, দলা দলা তাল তাল কালো রং। লালের মিশেল ছিল, না আমি ভেবেছিলাম?

তাকাতে কষ্ট হচ্ছে? থাক, তাকিয়ো না। এখন এই মুহূর্ত থেকে তোমার মাথার কোষে আটকে রইল। তুমি চোখ বন্ধ করলেই চোখের পর্দায় নেগেটিভ ছবির মত আলোকিত রেখায় আঁকা ঐ ছবি, চোখ তুমি কতবার বন্ধ করো একদিনে?

এখানে ধুলো, ধোঁয়া, বাতাসে ইঞ্জিনের পোড়া আর না-পোড়া তেল, তোমার কষ্ট হয়। তোমায় আমি নিয়ে চলেছি, দূরে। ট্রেনের জানলায়, সমান্তরাল শিকের পর্দায়, গাছ আসে আর দূরে যায়, চোখের আড়ালে, মানুষ, ইলেকট্রিক-পোস্ট, ধানজমি, পিচঢাকা পথ, মুদির দোকান। আমি তোমায় দূরে নিয়ে যাচ্ছি : দূরে। চোখ বোজো। মাথা এলিয়ে দাও আমার ঘাড়ে। চুল তোমার মসৃণ, কালো, এখন উড়ছে, সমুদ্রের গভীরে অনালোকিত উদ্ভিদের প্রশাখার মত, মায়াময়। হাওয়ার ধুলো মাখছে তোমার চুল, একটু বাদে শুকনো, ধূসর, কোমলতাহৃত হোক, তবু তোমার চুল উড়ুক, আমি নিয়ত আমার আঙুল দিয়ে তোমার চুল সরিয়ে দিই কপাল আর গাল আর কানের উপর থেকে, চুলের পুঞ্জে সমবেত করি। তোমার মাথা এলিয়ে দাও আমার কাঁধে। তোমার চিবুকে, চোয়ালের তলায়, গলার বাঁকে আমি চুল সরাচ্ছি, না, চুল সরানোর ভান, আমি আঙুল বুলিয়ে দিলাম। তুমি শরীর ছেড়ে দাও, আরাম, হাওয়া, চুল উড়ছে, বাইরে ট্রেনের থেকেও বেশি গতিতে বক উড়ে গেল, পিছলে গেল রোদ্দুরের ডানা, তুমি চোখ বুজে থাকো।

ট্রেনের বাইরের ছিটকে যেতে থাকা ধানজমি, পিচপথ, মুদির দোকান, সাতবয়স্ক দাদার আশ্রয়ে তিন ও পাঁচবয়স্ক ভাই, ওখানে কোনো পুঞ্জীভূত কালো নেই, লালের ছিটে, ওখানে কোনো শবদেহ নেই, মৃত্যু নেই, খুন নেই, ছিন্নবিচ্ছিন্ন হাত পা কান গলা ঠোঁট ও চিবুক নেই, সবকিছু, সবাই ওখানে সমগ্র, পূর্ণাঙ্গ।

একটু আগে, শিয়ালদা সাউথ স্টেশনের গায়ে কাত করে ঠেস দিয়ে রাখা হাত উড়ে যাওয়া মৃতদেহ দেখে তুমি কষ্ট পেয়েছিলে, আমি পাইনি, আমায় পেতে নেই, আমার কনুই তুমি আঁকড়ে ধরেছিলে, ভয়ে আতঙ্কে।

বলো, সত্যি করে বলো, তুমি আমার কনুই আঁকড়ে ধরেছিলে, না আর কেউ? আর কোনো মেয়ে আঁকড়ে ধরেছিল আমার না অন্য কোনো পুরুষের হাত : তার সঙ্গী? ঘনিষ্ঠ শরীর আরো ঘনিষ্ঠ হয়, পুরুষটির সুঠাম শরীর দিগন্ত থেকে দিগন্ত অব্দি বিস্তৃত হয়, ঢেকে ফেলে সব মৃত্যু, সব কালো অন্ধকার মৃত্যু, মেয়েটির চোখে শুধু নিরাপত্তা, ঘনিষ্ঠ স্থির ও দৃঢ়।

তুমি যাই বলো বুলা, হ্যাঁ করো আর না-করো, তুমিই আমার সঙ্গে, তোমার কিরণ, তোমার কিরণময় উপস্থিতি আমার সঙ্গেই, আমার অঙ্গে অঙ্গে, আমার কনুই-এ, শরীরে, তোমার উপস্থিতি, তুমি আমার।

আমার কাঁধে মাথা এলিয়ে কপালের মৃদু ঘামে জানলার আলো, আলো নড়ছে অথবা তোমার শরীর, ট্রেনের গতিতে, বড় বড় কালো চোখ টানটান খুলে তুমি কী দেখছ? আমার মাথার ডানপাশ, ঘাড়, চুল, আমি, যাকে আমি কোনোদিন দেখিনি, জানিনা কেমন দেখতে। আমি বাঁ-হাত তুলে আনলাম। তোমার চোখের পাতায় আমি তর্জনী রাখলাম, আস্তে, আলতো, আমি চোখের পাতা বুজিয়ে দিই। তুমি কোনোদিন কারো চোখ বুজিয়েছ? চোখ যা আর গতির বিদ্যুৎ উৎকীর্ণ হবেনা, বোজানোর পরে গঙ্গাজলে ভেজা তুলসীপাতা। শীতল, স্নিগ্ধ, শান্তি, কী আরাম। আমি তুলসীর গন্ধ পাই, সতেজ স্বাস্থ্যের আভায় উজ্জ্বল তুলসীপাতার গন্ধ, আমি চিবোলাম, লাল সিমেন্টের বেদিতে, উঠোনের বাগানের একধারে তুলসীগাছ পোঁতা থাকত, আমার মামার বাড়িতে, উপরে দুটো কাঠির মাথায় বাঁধা দড়িতে ফুটো করা মাটির কলসী — দিদিমা মরে গেছিল আগে না তুলসীগাছটা? — আমি পাতা আর ঝুরো ঝুরো পরাগ ছিঁড়ে চিবোতাম, শরীরে তুলসীর গন্ধ, আমি পাই, ওর গোড়ায় দিদিমার লাশ রাখা ছিল। অর্শের আর ব্লাড প্রেশারের লাশ। তখন সাদা আনকোরা থানের ঢেউ। ফোটোগ্রাফার দাঁড়ানোয় সেজমামীর ছোটবোন স্লিভলেস লোকাট ব্লাউজ আঁচলে ঢেকে নেয়, আঁচলে রং ছিল, আসেনি, বিবর্ণ ধূসর, মৃত্যুর ছবি কালারে না, ব্ল্যাক-অ্যান্ড-হোয়াইটে ভালো আসে।

আমি এত মৃত্যুর কথা বলি কেন? মৃত্যু, মৃত্যু, মৃত্যুভয়? অচিন্ত্য হোমিওপ্যাথ, বলেছিল অ্যাকোনাইট ন্যাপেলাস, নাকি অন্য কিছু আমার ওষুধ? কিসের ওষুধ? মৃত্যুর কথা বলার?

তার চেয়ে আমি তাকাই ওই দেশে, জানলার বাইরে, যেখানে মৃত্যু নেই। আমার চোখ : দৃষ্টি তোমার শরীর ছুঁয়ে জানলার বাইরে, যেখানে গতিশীল স্থির কিন্তু কম্পমান সশব্দ ট্রেনকে রেখে পিছনে ছুটে চলে যাচ্ছে আকাশ মাটি পৃথিবী মৃত্যুহীন দেশ। আমি এখন তোমায় দেখিনা, তোমার শরীর যা নিস্তব্ধ হবে, চোখ যাতে তুলসীপাতা দেওয়া হয়, আমি মৃত্যুহীন দেশ দেখি, চলমান। এরকমই হয়। স্টেজকোচ সিনেমায়, কার সেটা : জন ওয়েন হয়ত, প্রস্তর প্রান্তর, পাহাড়, পর্বত, সানুদেশ, অরণ্য, পর্দা জুড়ে দুর্দান্ত প্রকৃতি, তবু চোখ টানে দর্শকের খুব ছোট দুর্লক্ষ্য স্টেজকোচের গতি। প্রকৃতি অনড়, গতিশীল যান। আমি অনড় যান এবং শরীরের উপর দিয়ে গতিশীল প্রকৃতিকে দেখি।

২।। কখনো হাঁটি আমি, কেন, তোমাকে খুঁজি? কেন? তুমি আমার সঙ্গে থাকো, সদাসর্বদা।

হাঁটি, হাঁটতাম এভাবে, হাঁটি সেই একইরকম। আমার কিছু করার ছিলনা।

হাঁটতে হাঁটতে আমি গল্প করি, ঠোঁট অনড় থাকবে, এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে।

তোমায় আমি নকল করি, সন্ন্যাসী, হাঁটতে হাঁটতে আমি হাঁটার গল্প করি, হেঁটে চলার, তোমার সঙ্গে। আমার বলে চলা। আমার কিছু করার থাকেনা। এত শূন্যতা। শূন্যতায় পূর্ণ আমি। শূন্যতা : আমি । অনেক অনেক শূন্য, অশেষ শূন্য আকাশ নেই এমন ব্রহ্মাণ্ড তুমি দেখেছ গৌতম, হে সন্ন্যাসী?

না গৌতম, এ হাঁটার গল্প তোমায় আমি শোনাব না। এই হাঁটার গল্প, গল্প বানাত গল্পকার, মুহূর্ত জুড়ে জুড়ে মুহূর্ত মিলে মিলে গল্প হয়, ঘুম ভেঙে উঠে তার অনেকটাই বিস্মৃতি, হাঁটার গল্প আমি তোমায় শোনাব না সন্ন্যাসী। তুমি গল্প শুনতে শিখবে, গৌতম? শেখোনি তুমি কিভাবে গল্প শুনতে হয়, পথে শবদেহে ল্যাম্পপোস্টে নদীর জলে নারীর লাস্যে। শুধু নিজের গল্প খোঁজো। তুমি কীর্তিমান, তুমি সন্ন্যাস বানাও। কীর্তি মানেই বানিয়ে-তোলা। অনেক সন্তান, হারেম, উপন্যাস, নেতৃত্ব, সন্ন্যাস, অর্থ। তুমি বানাও, বনাওটি তোমার কালোত্তীর্ণতা, বনাওটি তোমার কাল। তোমায় আমি ঘেন্না করি।

এভাবে কোথায় পৌঁছব, ঘেন্না করতে করতে, কোথায় পৌঁছনোর কথা, আমি জানিনা।

ঘেন্না করি ডানদিকটাকে, ঘেন্না করি হৃৎপিণ্ড, ঘেন্না করি আমার সন্তান। সবকিছু ঘেন্না করতে করতে আমি কোন পথে হাঁটব, কোন পথকে আমার রক্তনালীর ভিতর আনি? তোমার পথ, তোমার প্রব্রজ্যা তোমার উদ্দেশ্য, গৌতম। উদ্দেশ্যকে আমি ঘেন্না করি।

৩।। এসো বুলা, এইখানটায় বোসো, কাছে, খুব কাছে। আমি কথা বলব, অনেক অনেক হেঁটেছি, তুমি কাছে বোসো, আমি বলি, কথা বলতে বলতে বলতে ক্লান্তি, গলার ভিতর, ঘাড় সোজা রাখাও বেদনার, শরীর নুয়ে যায় আমার, তোমার শরীরে আশ্রয় দাও, তোমার বারবার পরে নরম লালপাড় ঢাকাই শাড়ির প্রায়-এথনিক কোমলতায়।

উল্টোডাঙ্গা স্টেশন পেরিয়ে এলাম। ট্রামলাইন। ট্রামলাইন ছড়িয়ে পড়ছে, কেন্দ্র থেকে দূরে, আরো আরো পরিধির দিকে। আরো ছড়ায়, আরো, ট্রামলাইন পাতা হয় বাগমারি বস্তির দিকে। ব্রিটিশ রেল এনেছিল, রেলব্রিজের নিচে মাথা নোয়াই, নোয়ানো ঘাড় থেকে পাঁচ থেকে সাত ইঞ্চি ভগবানের নিকটতর ট্রেন চলে যায়। ট্রেন চলে যাওয়ার শব্দ তুমি আনো, বারবার, বারবার, আহা বেচারা তারকোভস্কি, গ্লাস টেবিল থেকে পড়ে যায় শিশুর দৃষ্টিঘাতে : প্রতিবার : প্রোজেক্টরে সেলুলয়েড ঘোরে, ট্রামলাইন আর রেলব্রিজসম্পন্ন রাস্তা থাকে একই জায়গায়, বাগমারি বস্তির দিকে।

আমরা, আমি আর তুমি, বুলা তুমি তাকালে। বাসনায় তাকাও, দেখলাম একজন ফেরিওলা। পরিধির পেশা, কেন্দ্রেও থাকে, পুঁজি তাকে ভাঙতে পারেনা। আচার, কুলচুর, চাটনি, শৈশব, জিভ তখনো শুধু মুখগহ্বরে, লঙ্কাগুঁড়ো, বয়ামে বয়ামে ইস্কুল কলেজস্ট্রিট জ্বলন্ত ট্রাম আচার খেতে ইচ্ছে করছে? না সোনা, তুমি ভালো মেয়ে, শুধু বাসনায় তাকাও, জীবনে শৃঙ্খলা রাখো। হেঁটে যাও। দাঁড়ালে না তার, ফেরিওলার সামনে। আমি দেখলাম, টকটকে লাল। কী রং বুলা, চোখের উৎসব! তোমার পিঠে ঘাম জমে, ব্লাউজের গোল করে কাটা পিঠ, আলো চিকচিক, আলোর উৎসব।

জং-ধরা লোহার মত লাল, রাস্ট-কালারের ব্লাউজ পরো কেন তুমি, তুমি কালো মেয়ে, কালো মানে শরীর, শরীরে রোদ্দুর আর রোদ্দুর, অবিরত ট্রপিকাল রোদ্দুর, কালো মানে ঘামে সেনশুয়াল চামড়া নিয়ে নড়তে থাকা পেশি আর হাড়ের কাঠামো, বুলা তোমার জন্য আমি দেখেছিলাম, খয়েরি পাড় মাখন রং শাড়ি আর সবজেটে অফ-হোয়াইট ব্লাউজ, তোমার কালো সেনশুয়ালিটিকে আন্ডারলাইন করো। প্রতিটি খাঁজের আর বর্তুলতার আলাদা আলাদা কালো আভা।

কামরাঙা কাটছিল শৈশব ফেরিওলা, আমি খাই, তুমি খেলেনা। একাই খাই। তুমি তোমার জীবনযাপনে শৃঙ্খলাকে রাখবে, আমায় তিরষ্কার করলে, চিত্রনাট্যে এরকমই ছিল। লঙ্কাগুঁড়ো আর লঙ্কাগুঁড়ো, আমার বৃহদন্ত্রের দেওয়াল জ্বালা করে আজকাল, টের পাই, টের পাই না, মেরুদণ্ড বেয়ে মাথার পিছনে বেদনা উঠে আসে, মুখে ঘাম ফোটে, কপালে, নাকের ডগায়, জ্বলে যাচ্ছে আমার অভ্যন্তর, নানা ধরনের সচ্ছিদ্রতা, ছিদ্রময়তা গড়ে উঠছে।

তুমি আমার পাশেই, যেমন হয় তোমার উজ্জ্বল ছায়া, সকালের রোদে, সকাল ছটা পঞ্চাশে তোমার দেড়তলার ঘরের জানলায় তুমি এমনিই এসেছিলে, জানতে না আমি ওখানেই থাকব, বাইরে ঘাসজমিতে, মেট্রোপলিসের ঘাসে সকালের শিশির জমে প্রচুর, ছটা পঞ্চাশে। শীতের সকালে কুয়াসা ততক্ষণে সরে গেছে। জানলায় গ্রিলের মাধ্যমিকতায় ঘুম-অগোছালো চুলের সীমান্তে চিবুকে আলোর আভা টিপহীন তোমার মুখ, তোমার উজ্জ্বলতায় ছায়া যেমন হত, তখন, সর্বদা, এখন আমি সেই উজ্জ্বলতায় উৎকীর্ণ কামরাঙার তারার মত আকৃতিকে আঙুলে ধরি। থরে থরে উজ্জ্বল সরসতা।

তীব্র অম্ল। আমার অ্যান্টাসিড খাওয়ার কথা খেয়ে ওঠার পনেরো কুড়ি মিনিট পরে। অন্তত এটুকু সময় লাগেই, এইচসিএল বহিরাগততার জীবাণু অপনোদন করে। বুলা তুমি বহিরাগত ক্রমে আমার আত্মায়, গত জন্মেও কি আমার এই একই শরীর ছিল? বুলা তুমি উজ্জ্বলতা

ডায়মন্ড কাটা চুড়িকেই দায়মল কাটা বলে

উজ্জ্বলতা একটি শব্দ বুলা, উজ্জ্বলতা একটি সামাজিক ছবি, স্বীকৃতি, কন্ট্রাক্ট, আমি উজ্জ্বলতা নামক সামাজিক শব্দকে তুলে আনি, তোমার শরীর উজ্জ্বলতা, আমার শৈশবে কৈশোরে যৌবনে ঢুকে আসে, কলকাতায়। তোমার গোল করে কাটা ব্লাউজ, পিঠের চিকচিকে সোনালি লোম, গাঢ় বাদামি কালো পারস্পেক্টিভ। আমি তোমার পিঠে রোদ্দুর সোনালি লোমের গোড়ায় ঝর্না ফোটাই, প্রত্যহ পাহাড় পেরিয়ে সূর্যোদয়, হিরণ্য আলোক সম্প্রমাতের আগের রাঙা বৈকুণ্ঠ, থরে থরে গাছের বনাঞ্চল, আলো আর আলো, প্রাগ-ইতিহাস আলো, সেখানে পাথর, পাথরের ঘন রং, আমার আদিম মানবী, বুলা, তুমি, তুমি পাথরের আদিম রহস্য।

তোমাকে আমি হাঁটার গল্প বলি।

কত বছর আগের তোমার পান সবুজ শাড়ির আঁচল আমাকে পথ থেকে পথে নিয়ে চলে, আমি পথকে এখানে নিয়ে আসছি, যে পথে হেঁটেছিলাম, হাঁটব কোনো এক দিন।

৪।। বুলা, তোমার একটা মেয়ে আছে।

তোমার তোমার শরীর থেকে উৎসৃত, শরীর থেকে শরীরের প্রবহমানতা। শরীর থেকে শরীর নিরপেক্ষ বাতাসে এসেছে কি সঙ্গত বঙ্কিম পথে, না তাকে বাতাস দেওয়া হয়েছে খাড়া সরাসরি, তোমার মধ্যদেহের উপর ধাতব আঘাতে? তোমার কষ্ট হয়েছিল? খুব? অথবা তোমার রক্তে তখন ঘুম ছিল, রসায়ন তোমায় নিজের যন্ত্রণার থেকে দূরে রেখেছিল?

তোমার শরীরের কথা জিগেশ করেছি, বুলা, এইমাত্র। তখন, সেই কৈশোরে, তোমার শরীরের কথা ভাবিনি। সুরজিত গাঁজা খেয়ে বসেছিল গাছের গোড়ায়, তপনদার দোকানের পিছনে, সংস্কৃত কলেজের সামনে দিয়ে ইস্কুলে ঢোকার ছোট দরজার পাশে। আমার কাছে পয়সা চায়, হয়ত মিষ্টি খেয়ে নেশা বাড়াবে, অথবা বাড়ি ফেরার বাসভাড়া খরচ করে ফেলেছে, ওর হাত আর কাঁধ ধরে তুলে নিয়ে আসি ইস্কুলের ভিতরে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আর্কিটাইপ থামের বারান্দায়, উঁচু দেবদারু গাছের মাথা থেকেও রোদ্দুর চলে গেছে, ইস্কুলের শান-বাঁধানো চিলতে মাঠে বল-পেটানোও শেষ। সুরজিত কেঁদে ফেলে, নেশা করে কাঁদে যেমন, এখন আমিও, ক্লাস টেনেই ও তখন পাকা গেঁজেল। নিসঙ্গ রোদে জ্বলে যাওয়া হলুদ থামে গায়ের হেলান, সুরজিত ওর প্রেমিকার কথা বলছিল, মুখ চোখে জল, ওর নেশা তখন কমে এসেছে, ওর প্রেমিকার পূত পবিত্রতা : প্রেমিকার শরীরকে ও একদিনও ভাবেনি, ভেবে হস্তমৈথুন করেনি, অন্য প্রায় সব নারীতেই যা ঘটে থাকে।

তোমার গোপন শরীর, তোমার সন্তানের কাছে যেমন, আমার কাছেও নিষিদ্ধ, তুমি তখন আমার মা থাকো। কারণে অকারণে শুধু তোমার, তোমার শরীরের কাছে পৌঁছতে চাই, কেন জানিনি স্পষ্টতায়, তুমি দেখো না তোমার মেয়েকে : তোমাকে শুধু চোখে হারায়।

তোমার শরীর কল্পনায় আসেনা, আমি তোমার কথা ভাবি, তোমার শরীর ভেবে হস্তমৈথুন নয়, শরীরের ভাবনায়, কামে, উল্লাস থাকে, তুমি আমার বিষণ্ণতা।

৫।। আকাশে মাটিতে জলে, মাছের কানকো আর পাখির ডানায়, পাখার আলো ওই ছড়িয়ে গেল পূবপাহাড়ের সানুদেশে, একাকী বিচ্ছিন্ন আলোকরশ্মি, বিষণ্ণতা, মাটির পৃথিবীতে বিষণ্ণতা হাঁটে, তার শরীরের সামনে ও পিছনে বায়ুস্রোত নির্দ্ধারিত হয়, চুমকি বসানো জরির লাল ওড়না তুলে রাজস্থানী বৌ দেখেছিল বালির পাহাড়ে, বালিয়াড়িতে কাদের পায়ের ছাপ শুধুই অনির্দেশ্যতার দিকে, কার শুধুই হারিয়ে যায়, কোথায়? বিষণ্ণতা?

আমি ভ্রমণে থাকি, আমার চলন্ত কলমের চারপাশে বলয়ে বলয়ে উপকথার জন্ম হয়, পরিভ্রমণে, প্রব্রজ্যায় থাকি, নিরন্তরই

আমি ঘুরছি

নিবিড় ঘূর্ণীপাক

এই মিলিয়ে গেল হাত পা এই সন্ধি এবং যুদ্ধ, এই দুর্বিপাকের রৌদ্রদাহের পর শষ্যরোপণ, এই আঙুল, এই মুখ, চোখ, হাত, ছিটকে বেরিয়ে গেল, ধরো, জার্মানির মল্‌ন শহরে তিন তুরস্ক রমণীর গর্ভের শিশু বেরিয়ে উড়ে গেল রডোডেনড্রন মেঘে, আমি বৃষ্টি দেখছি, কন্যা। তোমার পদপাতে আলো জ্বলে ধরণীর পথে, নাগার্জুন কেরল সাগরের তীরে বসে ছিল, ঢেউ দেখবে নাগার্জুন, ঢেউয়ের পিচ্ছিল শরীরে নিহত অন্ত্যজ প্রেমিকার সেনশুয়াল শরীর, শরীর দেখবে, শরীর, শরীর

শরীর দেখবে খোকা, শরীর? নারী শরীর, কলেজ গার্ল, সাউথ ইন্ডিয়ান, ঋত্বিক ঘটকের মত মুখসম্পন্ন আমার পিতামহ আমায় বলেছিল, মিউজিয়ামের পিছনে, সদর স্ট্রিটের মোড়ে, পার্কস্ট্রিটের পুরোনো লাল বাড়ির আরো পুরোনো রিডিং রুম থেকে রাত্তির-লাঞ্ছিত আমি বাড়ি ফিরছিলাম। বায়োস্কোপে চোখ দাও, নারী দেখো, নারী

আমি ঘুরছি

ঘূর্ণীপাক যার কোনো কেন্দ্র ছিলনা।

আমি নড়ছি।

নড়ে বেড়াচ্ছি আমি তোমার জঠরের ভিতরে বাইরে। তোমার গর্ভের পূর্বে ও উত্তরে।

দক্ষিণ ও পশ্চিম থেকে তখন মৌসুমী হাওয়া, মেঘ, বৃষ্টিপাত, ঘষাকাঁচধূসর পৃথিবী, বারংবার বারংবার। বৃষ্টি থেকে বৃষ্টি, আমি বেঁচে থাকি বুলা। ময়দান যখন সত্যিই সবুজ, সবুজ বলে মনে হয়েছিল, অদূরে প্রোথিত থাকে রোরুদ্যমানা মনুমেন্ট, লক্ষ ধারায় লক্ষহীরা জলগয়না তার শরীর ভাসায়। তুমি ভিজছিলে, কলকাতা দেখেনি, কলকাতা দূরে, দূরে দূরে ছিটকে চলে গেছে, বৃষ্টির প্যাথোজ অফ ডিসটান্সের অন্য পারে।

বৃষ্টির স্পনসরশিপে দুর্গাপ্রতিমার মত চওড়াফ্রেম তোমার শরীর তখন জেগে উঠছে রোরুদ্যমানা কলকাতার জলে, মাটিতে।

জল কত জল, জলের উৎসব।

জলের শাড়ি, জলের ব্লাউজ, জলের আঁচল নড়ে, জলময়দানের বুকে জলমানবী তুমি নড়ছো। ঢেউ, ঢেউ, কত ঢেউ ওঠে, বেলাভূমি, জল তোমার অবয়ব। আমি নাগার্জুনকে পাই। নাগার্জুন তার নারীকে খুঁজত, বেলাভূমির নিরবচ্ছিন্ন ঢেউয়ে, নারী তখন নিহত, হয়ত বা আত্মঘাতে, উচ্চবর্ণ নাগার্জুনের প্যাথোজ অফ ডিসটান্স, প্যাথোজ অফ নোবিলিটির দুরপনেয়তা। নাগার্জুনের মৎস্যজীবী প্রাকৃত তামসিক কামচর্চার নারী তখন নিহত। সন্ধ্যায়, প্রভাতে, প্রতিমাসন্দর্শনের আবছায়া : টোয়াইলাইট অফ আইডলস-এ নাগার্জুন সমুদ্রঢেউয়ের তৈলাক্ত আলোক শরীরে নারীকে খোঁজে, প্যাথোজ, প্যাথোজ, একাকীত্বে চলে যাবে, ফ্রম স্পিচ টু হুইস্পার টু সাইলেন্স-এ নাগার্জুন, মৌনব্রত, মৌনী নাগার্জুন ভারতবর্ষের মাটি পাথর ধুলো ভাঙে, পশ্চিমঘাট থেকে হিমালয়, কন্যাকুমারীর মৃত মৎস্যকন্যা, মৃত কুমারীকে নিয়ে ভোটবর্মায় পৌঁছয় : রাজগুরু। বৌদ্ধদর্শনকে নতুন করে লেখে। কার বৌদ্ধদর্শন, বুদ্ধের না নাগার্জুনের? আমি তোমাকে লিখি, বুলা, আমার সকল লেখা নিয়ত তোমাকে লক্ষ্য করে। তুমি বদলাবে, বদলেছ, বদলাচ্ছ মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে, আমি লক্ষ্য করে চলেছি, আমার লেখারা। তুমি তাদের উদ্দীষ্ট, তুমি তাদের লক্ষ্যভেদ, তোমাকে দীর্ণ বিদীর্ণ করি, টুকরো টুকরো করে তোমায় ছড়িয়ে দিই নগর কলকাতার পথে পথে।

কার ছবি? ফাসবিন্দার? পুং যৌনাঙ্গের আকৃতির তীর নিয়ত ছুঁড়ে চলে তীরন্দাজ, যোজন দূরে উপবিষ্ট নায়িকা, দুই পা ছড়ানো, দি ইটারনাল ওয়াই, ছুঁড়েই চলে।

জলকুমারী তোমাকে আমি লক্ষ্য করি : জল ছিটিয়ে তুমি নড়ো, বহু দূরে ম্লান অস্পষ্ট চ্যাটার্জি ইন্টারন্যাশনাল টাইগার সিনেমা হিন্দুস্থান বিল্ডিং-এর কলকাতা। ঝর ঝর ঝর বারি সিঞ্চন : তোমার গভীর থেকে আর একটা শরীর জেগে উঠছে।

তোমার চটি, পাতলা, ব্যবহৃত, ছিঁড়ে ছিটকে যাবে দূরে। তুমি ব্যথাহত, বা, আমি তাই ভাবি, ডান পা তুলে পায়ের পাতা দেখার চেষ্টা করো। আমি নিচু হয়েছি, তোমাকে নিচু হতে হবে কেন? জলে ভিজে গাঢ় নীল আমার জিনস-এর উরুতে তুমি পা রাখো। জল আমাদের চতুর্পার্শ্ব, আমাদের দূরত্বকে ভরাট করেছিল। জলে ভিজে তুলতুলে তোমার পায়ের পাতা, আমি দেখি। মানুষের চামড়া, মানুষীর, কী বিস্ময়কর, জলে ভেজা নরম চামড়ার নিচে স্পষ্ট হয়ে ওঠা রক্তচলাচল, তোমার জীবন।

মুখ নামাই আমি। তখন দেখিনি, আমার দুচোখের পাতা বুজে গিয়েছিল, এখন আমি মুখে হাসি লিখি, বৃষ্টিতে আহৃদয় ভিজে ওঠার নাটকীয়তায় অকারণ ব্রীড়া থেকে মুক্ত।

আমার মুখে তোমার পায়ের পাতার নরম ঘোলাটে মাংসপিণ্ডের স্বাদ আমি পাচ্ছি। উল্লাসবাদামি তোমার চামড়ার নিচেই তোমার রক্ত ছিল, কণিকার গতি : তুমি।

আমার শব্দরা তোমায় নিয়ত লক্ষ্য করে, তুমি আমার শব্দ লক্ষ্য করো বুলা : উল্লাসবাদামি। বাদামি : গাঢ় রং ক্রমে কালো : অনার্য চামড়ার রং আমার ভাষায়, যা আমার কাছে প্রদত্ত, কখনো আনন্দ, উৎসাহ, উল্লাসে আসেনা। আসে বিপরীতে, ঘন কালো বিষণ্ণতায়। তোমার কাছে পৌঁছনোর এই যাত্রা আমার নিজের ভাষার বিরুদ্ধে যাত্রা, বুলা, একই যাত্রা অনেক অনেক যাত্রা, একই গতি অনেক গতি, সব গতি কি আমি নিজেও বুঝি?

৬।। কামরাঙা তারকাখণ্ডে সরসতা। লঙ্কা, ঝালনুন, লঙ্কা : শরীরে ব্যগ্রতা সৃষ্টি হয়। লালাক্ষরণ। আমি শরীর চিনি। জীবন শরীরে থাকে। কোনো এক দিন আমি ইতিহাস, তখন আমার শরীর হয় পঞ্চভূত। আমি নেই। আমার উদ্বেলতা নেই। জিভ থেকে শরীর কামরাঙা তারকাখণ্ডের উল্লাস নেই। রং-এর বোধ নেই।

৭।। ট্রামলাইন বাঁধানো পথে আমরা হাঁটতেই থাকব। সেদিন আমাদের আর কোনো কাজ ছিলনা, তাই আমরা পরিধির, ইনফর্মাল সেক্টরের জীবনগুলির পাশ দিয়ে হাঁটতেই থাকব। বুলা, আমার গুলিয়ে যাচ্ছে, তখন তুমি কোথায়, বোকারোতে, বিবাহে, আমার সঙ্গে কে ছিল, কোন নারী? আমি কি তোমাকে খুঁজেছিলাম? বস্তির ঘর, কোনোটা ঘর, কোনোটা ঝুপড়ি, আমরা হাঁটতে থাকি। একটা চিনামোরগ হঠাৎ লাফিয়ে আসে পথে।

আমি ভয় পেলাম।

কেন?

কোনো কিছু দেখলেই আমি ভয় পাই কেন?

তুচ্ছ চিনামোরগ, সাদা কালো চৌখুপি পেটমোটা সরুঠ্যাং ডাচশুন্ড কুকুরের মত, আমি ভয় পাই কেন?

তার সামান্য আগে, পাশে আঙুল তুলে হাঁটতে হাঁটতে আমায় দেখিয়ে থাকবে রিসাইক্লিং, সারা কলকাতার জঞ্জাল জড় হয়, বস্তির মানুষের পেশা, পরিধির, কলকাতার, আধুনিক পুঁজি কলকাতার জঞ্জাল কুড়িয়ে পরিধি বেঁচে থাকে, একটুও শীর্ণ হয়না।

সামান্য ঠোঁট ফাঁক করো, তুমি উজ্জ্বল চোখে তাকালে, বিদ্যা বিকীর্ণ তোমার চশমার কাঁচে, মাইনাস পাঁচ।

আমি জঞ্জাল জড় করছি, পথ থেকে পথ থেকে পথ থেকে, রিসাইক্লিং, তোমার গল্প করছি বুলা,

তোমায় এত করে ঝালনুন মাখা কামরাঙার মাথুর টক একটা টুকরো দিতে চাই, নিচ্ছনা, এ কী অসভ্যতা, আমি হাঁটছি : আমরা

তখন ঠিক তখনই কি তুমি তোমার বিবাহিত প্রেমিকের সঙ্গে : বোকারোতেও কি আছে চিত্তরঞ্জন প্রসূতিসদন? : কদিন আগেই আপাতত তুমি ফিরলে সেখান থেকে : তোমার শ্বশুরবাড়িতে? প্রথম বসন্তের দুপুর, তোমার মেয়ে হয়ত ঘুমোচ্ছে, কত ইঞ্চি? তোমার মেয়ে কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাসে? ভগবানের সঙ্গে কথা বলে? কোন ভগবান? তুমি শান্ত হতে পারো না কেন বুলা, বাতাসে, রাতের কাঁচে, প্রতিফলনে, প্রতিপ্রতিফলনে, কী তোমার চঞ্চলতা? আমি দেখি, তোমাকে এত অস্পষ্ট লাগে কেন বুলা, এখন, জানলার অন্ধকার কাঁচে, বাইরে রাত অন্ধকার।

সল্টলেকের পথ এখন ঘোড়াদের দখলে, ঘোড়ারা হাঁটছে, আমি বারান্দায় গিয়ে নিচে তাকাবনা, ভয় পাই, এত ভয় কোথা থেকে আসে?

৮।।

এই লেখাটা শেষ হলনা। গোপালবাবুর মোট লেখাও তাই। রাশি রাশি খাতা, পাতার পর পাতা খুদে খুদে বাংলা অক্ষরে, কোথাও কোথাও ইংরিজি, স্তূপ স্তূপ লেখা। একটা জঙ্গল, কোনো দিকে কোনো শেষ নেই। মিহির চলেছে, কখনো পথ হারিয়ে ফেলে, আবার খুঁজে পেয়ে গেল তার রাস্তা, বা মনে করল পেয়ে গেছে — হেঁটেই চলে। আর পথই বা কী? যা দিয়ে হাঁটে সেটাই পথ। এরকম ভাবতে আরাম পায় মিহির। সত্যি সত্যিই এমনটা যদি বাঁচা যেত। নাকি আসলে জীবনটা এরকমই? সবসময় টের পাওয়া যায়না তার আভ্যন্তরীন এলোমেলোপনাটা, কিন্তু একটা এলোমেলোপনা থাকেই। সেই যে ইস্কুলে পরীক্ষার আগে আগেই একটা নোটিশ দিল — ইস্টার্ন কমান্ডের অফিসে গিয়ে দেখা করো, যারা সৈন্যবাহিনীতে যেতে চাও। ইস্কুলে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে থাকত মোটা বিশু, গায়ে খুব জোর ছিল ওর, এক ঘুষিতে একবার একটা বেঞ্চি ভেঙেছিল, ও চলে গেল সৈন্যবাহিনীতে, আগেই এনসিসি করত। কত বছর, কত বছর কি মোলায়েম ভুলে গেছিল মোটা বিশুকে। গত বছর একদিন দেখা হল, বাড়ি এসেছে, এখন আর সৈন্যবাহিনীতেও নেই, দিল্লীতে একটা মাল্টিন্যাশনাল ওষুধের কোম্পানির সিকিওরিটি অফিসার, মোটা মাইনে পায়, গায়ে স্যুট, হালকা বাদামি সরু দাগের চেক ঘন বাদামি প্যান্ট, আর সেই একই কাপড়ের কোট। টাই অবশ্য নেই। আকাশি নীল জামা গুজে পড়া, কাঁধ আরো বয়স্ক চওড়া, মুখটাও গম্ভীর আর বয়স্ক আর ফরসা, দুটো ভাঁজ নাকের দুপাশ দিয়ে নেমে চিবুকের দিকে, প্রতিষ্ঠিত সম্পন্ন মানুষদের যেমন থাকে। চুল একটু ছোট ছোট ছাঁটা, কপালের দুপাশ দিয়ে দুটো ছোট ব্যক্তিত্ববান টাক — বিশুকে আর বিশু বলে মনে হচ্ছিল না, দুটো ভাঁজ আর দুটো টাক মিলে বিশুকে ফিল্মস্টারের মত করে দিয়েছিল। ঠিক ফিল্মস্টারও না, সিনেমায় খুব সফল এক্সিকিউটিভদের, বা, বিলিতি ধাঁচের ব্যবসায়ীদের যেমন দেখতে হয়। নিজে থেকে বিশু কথা না বললে মিহির চিনতেই পারত না, এত বিস্মিত হয়ে পড়েছিল যে কথাই বলে উঠতে পারেনি। কী বলে ডাকত সে? বিশু? য্যাঃ, তা হয় কখনো?

সে যদি আর্মিতে চলে যেত, তাকেও এখন ওইরকম সফল আর সম্পন্ন দেখাত? সে তো আরো অনেক বুদ্ধিমান ছিল। হেডমাস্টারমশাই একবার ক্লাস নিতে এসে তাকে ইন্টেলিজেন্ট বলেছিলেন। দিব্যেন্দু স্যারের ক্লাসে তার মত জ্যামিতির এক্সট্রা কেউ পারত না, তাও তো সে সারাদিন আড্ডা দিয়ে বেড়াত, ইস্কুল কেটে সিনেমায় যেত, সিনেমায় যাওয়ার পয়সা না-জুটলে, প্রায়ই জুটত না, অকারণেই ইস্কুল কাটত, সারাদিন ধরে রাস্তায় রাস্তায় হাঁটত আর মেয়ে দেখত আর হাঁটত।

অথবা, ছোটমামিমার ভাই যে প্রাইভেট ফার্মের ট্রেনি অ্যাকাউন্টেন্টের চাকরিটা জোগাড় করে দেবেন বলেছিলেন বোম্বাইতে, এখন তো বোম্বাই না, মুম্বাই, সেই চাকরিটাতেও যদি চলে যেত, তাহলেও জীবনটা কি একেবারেই বদলে যেত না? অফিসে গল্প শুনেছে মিহির, বোম্বাইয়ের জীবন একদম অন্যরকম — রাত নটায় বর বৌ বাচ্চা মিলে সমুদ্রের পাড়ে হাঁটতে যায়, ফুচকা খায়। সেও যেত অমন? সঙ্গে যে বৌ থাকত সে বাঙালি না মারাঠী? মারাঠী মেয়েরা কেমন কাছা দিয়ে কাপড় পরে — পাছা অব্দি পুরো পা-টা অনুভব করা যায় — বলিষ্ঠ চঞ্চল পেশিবহুল। ভাবতে গেলেই অন্যরকমের একটা বাতাস নড়ে, অন্য গন্ধ, সমুদ্রের পাড় বালি জল ঢেউ, দূরে আরব সমুদ্রের নিকষ শরীরে আলোকরেখাময় বোম্বে হাই, বালিতে কনুই রেখে মিহির দেখছে বৌয়ের কাপড়ের পাড় টানটান শরীরের বাইরে বালিতে উড়ছে ফরফর করে, হাওয়া, আরো হাওয়া, সমুদ্রের হাওয়া, জল নুন রাত্তিরের বাতাসের দানা এলোমেলো নড়ছে কাঁপছে ছটফটাচ্ছে — মিহির মিশে যাচ্ছে মিলে যাচ্ছে, হাওয়ায় দূরের সমুদ্র, আরো দূরের দ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ, লাক্ষা মিনিকয় অমিনদিভি দ্বীপপুঞ্জ, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল।

সে তো একবার ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের চাকরির পরীক্ষাও দিল। পরীক্ষার পেপারটা তো তার ভালোই হয়েছিল। ফেরার পথে বনগাঁ লোকালের ভিড়েও সে তার চারপাশটাকে ভুলে যাচ্ছিল। সুন্দরবন, ম্যাংগ্রোভ, সেই শিকড় দিয়ে জলাভূমির গাছ নিশ্বাস নেয়, আর ছড়িয়ে থাকা কাদা। ঘন থকথকে কালো কাদায় পা ডুবে যাচ্ছে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের নৌকো থেকে নেমে মিহির কাদার ভিতর ম্যাংগ্রোভের খোঁচ বাচিয়ে গিয়ে দাঁড়াল পাড়ে, হাত রাখল ভেঙে পড়তে থাকা, জলে মিশে যেতে থাকা অন্ধকার শ্যাওলা জল আর নির্জনতায় লাজুক নরম প্রাচীন ইঁটের কাঠামোতে, কবে কখনো দুশো তিনশো দুলক্ষ তিনলক্ষ বছর আগে মগ দস্যুরা এখানে আস্তানা গেড়েছিল, বা হয়ত বারো ভুঁইয়ার কেউ কোনো মন্দির বানিয়েছিল, এখন ক্রমে জল মাটি পৃথিবী হয়ে যাচ্ছে, মিহির হাত দেয়, দাঁড়িয়ে থাকে। জঙ্গলের গন্ধ পায়? একটু দূরেই নির্জন নির্মানুষ দ্বীপের কুমারী অচেনা দুর্গম জঙ্গলের গন্ধ? ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কুমীর প্রকল্পে চাকরি করে দুলাল, ও মিহিরের কৌতূহল দেখে মজা পায়, যেতে বলে, বলে, 'চলে আসো একবার মিহিরদা, আমি থাকার ব্যবস্থা করে দেব, বৌদিকে নিয়ে আসো নয়'। বৌ ওর থেকে ষাট টাকা কেজিতে দুবার আড়াইশো গ্রাম করে খাঁটি সুন্দরবনের মধু নিয়েছে, বাচ্চাদের জন্যে, সকালে তুলসীপাতার রস মিশিয়ে খাওয়ায়। অন্যদের থেকে দুলাল আশি করে নেয়, বলেছিল দুলাল।

যাওয়া হয়না। যাওয়া হয়ে ওঠেনা। কখনোই, কোথাওই যাওয়া হয়ে ওঠেনা, যেখানে যেতে ইচ্ছে করে মিহিরের। সেই জন্যেই কি গোপালবাবুর লেখার এই জঙ্গলের ভিতর ঢুকে যেতে হারিয়ে যেতে চায় সে? সত্যিকারের কোনো জঙ্গলের মত এই ঘরের ভিতরও আধো অন্ধকার। জানলা মাত্র দুটো। একটার গায়েই বাথরুমের দেওয়াল, আর সচরাচর সেটা বন্ধই থাকে। অন্য জানলাটার বাইরে বিরাট ঝাঁকড়া আমগাছের ঝুঁকে আসা।

আর লেখাগুলো? কোনো একটা খাতা হাতে নিল মিহির, কখনো কোনো নিয়ম মেনে পর পর, আবার কখনো খাতার সেই স্তূপ থেকে এলোপাথাড়ি যে কোনো একটা। কখনো প্রথম পাতা খুলল ধীরে ধীরে, কখনো হঠাৎ মাঝখান থেকে যে কোনো একটা পাতা, যে পাতাটার ধার আঙুলের ডগায় আটকালো : এবার? যে লেখাটা বেরোলো সেটা হয়ত বিজ্ঞানের কিছু। কিম্বা দুরূহ সমস্ত অঙ্ক। কিম্বা অন্য কিছু যা মিহির একটুও জানেনা। কত কত বিষয় যে এই পৃথিবীতে তার সম্পূর্ণ অজানা সেটা মিহির উপলব্ধি করতে পারছে এই খাতাগুলো থেকে। আগে তো অজানা বিষয় আছে কি নেই সে বিষয়েও কিছু জানতনা। আর লেখাটা যদি ওরকম কোনো বিষয়ের নাও হয়, বুলার লেখাও হয়, তাহলে?

তাহলেও কি বোঝে মিহির? সেখানেও বোঝা না-বোঝার একটা আলোআঁধারি। জঙ্গলে যেমন থাকে। যোজন যোজন উঁচু গাছেদের মহীরূহদের মাথায় মাথায় লটকানো থাকে সুদূর আকাশ। দেখা যায়না। জানা আছে বলে বোঝা যায়। আর গুঁড়িগুলোর মধ্যের মধ্যের মাটিতে আগাছা আর লতা আর ঝোপ আর ঘাসের মখমল সবুজ দুর্ভেদ্যতা। ঘন নিবিড় ওই পাতা লতা ঝোপ ডাল আগাছার একমানুষ দেড়মানুষ উঁচু দৃষ্টিরুদ্ধ গোলকধাঁধার মধ্যে যে রহস্য, যে অজানা ডাক, বিপদ এবং কুহক, তাকেই কি অনুভব করে মিহির গোপালবাবুর লেখার মধ্যে থাকার প্রহরে? একটা চরিতার্থতা, একটা স্বপ্ন, ছোটবেলা থেকে খুঁজছে, ঘটবে, কিছু একটা ঘটবে, কোথাও একটা পৌঁছবে মিহির, কোনো একটা দ্বীপে, সেই পৌঁছে যাওয়াটাই কি মিহির অনুভব করে?

নইলে এই লেখাগুলো তার জীবনকে, তার প্রতিটা মুহূর্তকে এভাবে বদলে দেয় কী করে?

কাল রাতে ভারত জিতল, ক্রিকেট ম্যাচে, পাকিস্তানের সঙ্গে। পাড়ায় পাড়ায় মোড়ে মোড়ে ত্রিপল টাঙিয়ে তাঁবু করে এক একটা সমবেত টিভি, খেলা, উত্তেজনা, চীৎকার, সঙ্গে মাংস অর পরোটা। বুবুন, মিতু, বাপি ওদেরই উৎসাহ। সঙ্গে মিহিরের বয়েসিরাও। তার কাছ থেকেও চাঁদা নিল ওরা।

মিহির গিয়ে দাঁড়াল ধার ঘেঁষে। সবাই উত্তেজিত। নানা ধরনের বাক্য, কাটাদের নিয়ে, শচীনকে নিয়ে, মনোজ বা আক্রমের টাকা খাওয়া বা না-খাওয়া নিয়ে, সবাই কথা বলে চলেছে, নিশ্চয়ই শুনছেও কেউ, নয়ত বলবে কেন? হঠাৎ খুব আরাম লাগে মিহিরের, খেলাটার প্রতি কৃতজ্ঞ, তাকে কেউ লক্ষ্য করছে না। লোক-সমাবেশের ধার ঘেঁষে, নালার কোণ দিয়ে, সিমেন্ট বাঁধানো নালার সরু প্রান্তের উপর পা রেখে রেখে ত্রিপলের প্যান্ডেলটার প্রান্তেরও বাইরে এসে দাঁড়াল, এক কোণে, এখানে শরীরের চাপাচাপি নেই। ক্লাব ঘরের টেনে বেঁধে-রাখা দরজার প্রান্তটা টিভিকে আড়াল করে রেখেছে, হালকা নীলচে কাঁচের পিছনে ওখানে আলোকিত এবং অন্ধকার বিন্দুতে কিছু একটা ঘটছে এইটুকু মাত্র বোঝা যায়। এখানে কেউ তাকে মনোযোগ দিচ্ছেনা, কেউ তাকে দেখছে না, সে শুধু দেখে যাচ্ছে অন্যদের। ছেলেকেও দেখতে পেল, আরো অনেকগুলো বাচ্চার সঙ্গে, টিভির একদম সামনেটায়, ইঁটপাতা ক্লাবঘরের মেঝেতে মাদুর আর সতরঞ্চি বেছানো। ওখানে, অত সামনে, রঙিন টেলিভিশনের অত কাছে, দু-আড়াই ফুট মাত্র, ওর চোখের ক্ষতি হবে না তো — দু-এক মুহূর্তের একটা দুশ্চিন্তা হয় মিহিরের মাথায়। তারপর ভাবে, কী-ই বা তার করার আছে? আর, ক্ষতি হলেই বা কী হয়, না-হয়েই বা কী হয়? কিছু লোকের চোখে তো ক্ষতি হয়েই থাকে, এবং কিছু লোকের চোখ অক্ষত থাকে, সেই ছোটবেলা থেকেই। তার ছেলে হয় এদিকের সংখ্যা একটা বাড়াবে, নয় ওদিকের, তাতেই বা কী এসে যাবে?

বরং ছেলেকে ডাকতে গেলেই এখন সবার নজর তার উপর পড়বে, তাকাবে, দু-চারটে কথা বলবে, এবং হয়ত উঠে বা না-উঠেই একটু সরে বসে একটা বসার জায়গাও করে দেবে। একজন কমবয়েসি কেউ। মিহিরের বয়েসিদের প্রতি পাড়ার যুবকেরা, মুড ভাল থাকলে, যেমন করে। যেমন করাটা প্রথা, একদা মিহিররাও করেছে।

বরং নিজের ছেলেকেই দেখে মিহির, দূর থেকে। এক একটা বলের পর টিভি থেকে আসা স্টেডিয়ামের চীৎকার বাড়ছে, চারপাশের চীৎকারও, ইংরিজি ধারাভাষ্যকারের গলার পর্দা, সবাই টানটান হয়ে যাচ্ছে, তার সঙ্গে ফিকে নীল চেক পাতলা-সুতির জামার নিচে ছেলেটার পিঠও। আবার উত্তেজনা কমলে নুয়ে আসছে। খুব একাগ্র হলে ছেলেটার চোখ যে এমন বিস্ফারিত হয়, ঠোঁটও ফাঁক হয়ে যায়, মুখ হাঁ হয়ে যায়, সেটা কি আজই প্রথম লক্ষ্য করল মিহির?

হাঁ-করে গিলছে ছেলেটা, পাশেই ইঁট পেতে বসে থাকা মনু কী বলছে। মনু এ পাড়ার হিরো, মিহিরের ছেলেরও। মিহির তো হিরো হতে পারেনি, না তার বৌয়ের কাছে, না তার ছেলের কাছে, কোথাওই না। হিরো হওয়ার মত কিছুই নেই তার, না চেহারা, না খেলা, না কোনো অসাধারণ সাফল্য। মনু ভালো খেলোয়াড়, যদিও ফুটবলের, এলাকার ফুটবলের থেকে এখন ময়দানের ক্লাবে গেছে, সুযোগ পেলে হয়ত সত্যিকারের বড় খেলোয়াড় হতে পারত। যেহেতু পাড়ার তারকা, আর হয়ত খেলাধুলোটাই ও মোটের উপর ভালো বোঝে, মনু কিছু বললে সবাই মন দিয়ে শুনছে, মিহিরের ছেলেটাও। কি আগ্রহী অনিমেষ হয়ে যাচ্ছে ছেলেটার চোখ। সে কি ছেলের এই চোখের মনোযোগ কোনোদিন পেয়েছে? সে কিছু বললে ছেলে শোনে, যতক্ষণ বলে ততক্ষণই শোনে, একটু কম না, আবার একটুও বেশি না। বাবা বললে কথা শুনতে হয়, জানে ছেলেটা, বৌ শিখিয়েছে।

কিন্তু কেউ তো এই মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনতেও পারত? এই মনোযোগ যা কোনো বাধ্যতা থেকে জন্মায় না। শুধু তৈরি হয়, শ্রোতার ভিতরেই।

মিহিরের কি দুঃখ হয় এই মনোযোগ পায়নি বলে? নিজের বৌয়ের কাছেও পায়নি বলে? বৌয়ের এই মনোযোগ সে কি চেয়েছে আদৌ? কার মনোযোগ চেয়েছে তবে — বুলার?

সে মনোযোগ নিশ্চয়ই গোপালবাবুও পায়নি। নইলে থাকত কেন এরকম একা একা — নিজের বুলার থেকে দূরে? আর সেই না-পাওয়াকে অতিক্রম করে যাওয়ার জন্যে এমন পাতার পর পাতা লিখত। সেই লেখা পড়েই কি সেও এমন বিচ্ছিন্ন দূরবর্তী হয়ে যাচ্ছে? কালকে রাতেও, জেতার পর তখন উৎসবের তাণ্ডব, আজকেও সারাদিন ধরে বারবার মনে হচ্ছে তার, এই কথাটাই, সেই ভোরবেলা থেকে।

কাল রাতে, সারা দুপুর-বিকেল-সন্ধে-রাত্তির খেলা দেখে সকলের বিড়ি-সিগারেট শেষ হয়ে যাওয়ার পরে সবাই একসঙ্গে দলবেঁধে বিড়ি সিগারেট কিনতে এসেছিল। আর বাজি। বৌ বেশ আগে থাকতেই ভাবতে পারে। কালীপুজোয় আনা বাজির যেটুকু পড়ে ছিল সেটুকু সকালে থেকে রোদে দিয়ে রেখেছিল — চকলেট বোম। বাপি ওরা এসে একলপ্তে সাত প্যাকেট চকলেট বোম কিনল, ওদের টাকা দেওয়ার লোকের অভাব হয়না। রাতে আবার মদ খাবে। হয়ত কিঞ্চিৎ আগেই খেয়েছে, দেখে তাই লাগছিল। ক্লাবঘর থেকে বেরিয়ে বিড়ি সিগারেট কিনতে আসা সবাইকে মিলিয়ে দোকানের সামনে একটা জটলা। গণেশ নেই। মিহিরই বিক্রি করছিল, আর দেখছিল। শুনছিল সবকিছু। দেখতে শুনতে পর্যবেক্ষণ করে যেতে এত ভালো লাগে কেন তার, ভিড় আর জটলার থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে বা বসে?

ভূপতি, ওর দুটো পা-ই কাটা গেছে লরি অ্যাক্সিডেন্টে বহু বছর আগে, এখন রবারের শিট বেঁধে রাখে হাঁটুর একটু আগেই শেষ হয়ে যাওয়া পায়ের মাথা-দুটোতে, ওর উপরেই হাঁটতে হাঁটতে এসে দাঁড়াল দোকানের সামনে রাস্তায়। ওর ফলের দোকান, স্টেশনে, আজ তাড়াতাড়ি বন্ধ করে চলে এসেছে, খেলায় খুব উৎসাহ। ভূপতির মুখ বুক থেকে দেখতে শুরু করলে ভেবেই ওঠা যায়না শরীরটা অত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। মুখ বুক কাঁধ বেশ বলিষ্ঠ। ভূপতি খুব আমুদে গলায়, একটু নেশাগ্রস্ততাও ছিল কি?— বলে, বলতে থাকে, 'ইন্ডিয়ার একটা ছক আছে, বুঝলে, আমি আগেই বলেছিলাম একটা ছক —' বলতে বলতেই ভূপতি বোধহয় অনুভব করে খেলা জেতার পুরো উত্তেজনাটা তার এই বাক্যে এলো না। তাই একটু থমকে থাকে, তারপর বেশ উঁচু গলায়, সোজা করা ঘাড়ের শিরা ফুলিয়ে চীৎকার করে, '— দে, দে শালা বাঞ্চোত কাটাদের ধরে হজে পাঠিয়ে। আজ দেখছিলাম শালা স্টেশনে আসছে পিলপিল করে, একটাও তো টিকিট কাটেনা'।

মিহির দেখতে থাকে। সে স্পষ্ট অনুভব করে ভূপতির গুলিয়ে গেল কোথাও একটা। ভূপতি এই কথাগুলো বলতে চায়নি। কী বলতে চেয়েছিল নিজেও জানেনা। বলে ওঠার মুহূর্ত অব্দিও ভূপতি জানতনা সে ঠিক কী বলে উঠতে যাচ্ছে। এটা জলের মত বুঝতে পারে মিহির। বুঝতে পেরে একটা আরাম হয় তার, মানুষের মাথার ভিতরটা বুকের ভিতরটা বুঝে উঠতে পারার উল্লাস। এমনটা বুঝে উঠতে পারলেই একটা নিশ্চিন্ত নির্ভরতাও জন্মায়। কেন জন্মায় তা মিহির বলতে পারেনা। কিন্তু জন্মায়। এই যে আর একটা মানুষ মনে মনে কী ভাবছে, ঠিক কী ভাবে তার প্রতিক্রিয়া জন্মাচ্ছে সেটা সে পড়ে ফেলতে পারছে, এতে কোথাও একটা সাহস আসে, নিজের মাথার ভিতর ঘুরতে থাকা অজানা ভয়টার থেকে দূরে থাকা যায় আরো কিছুক্ষণ।

এরকমটা মিহির বুঝতে পারে খুব। আজো সারাদিন ধরে দেখছে, আজ ডিউটি পড়ায় তার বেশ ভালোই লেগেছিল, রবিবার ফাঁকা ফাঁকা থাকে সব কিছু। ট্রেনে স্টেশনে অফিসে সব জায়গাতেই শুধু খেলা নিয়েই কথা। অফিসে সবকটা কাগজেরই

হেডলাইন তার চোখে এসেছিল, উল্টে পাল্টে দেখেওছিল। সেখান থেকে একটা কথোপকথন শুনে আন্দাজ করে নিতে পারা একটা লোকের একটা কথার পিছনে কোন কাগজের কোন খবরটা কাজ করছে। তারপর আরো একটু এগিয়ে লোকটার কোনো নিজস্ব ধাঁচ। লোকে একটা খবর কিভাবে পড়ে, এইসব। এইসব নিয়ে অনেককিছু দেখে জানে ভাবে বোঝে মিহির।

কিন্তু কী লাভ? কী লাভ এই দেখায়, এই বোঝায়? কী করবে সে এইসব নিয়ে? এগুলোই কি তাকে আরো একা করে দিচ্ছে, গোপালবাবুর ওই লেখার মত?

গোপালবাবু তবু লিখত। সে তো লিখতেও পারেনা। গোপালবাবুর লেখা থেকে গোপালবাবুর চিন্তাগুলোকে সে জানতে পারছে। তার গুলো তো কেউ জানতেও পারবে না। সে কি আদৌ জানাতে চায়? কেন? জানিয়ে লাভ?

জানাক বা না-জানাতে পারুক, এই জীবন তো তাকে কাটাতেই হবে। দরজা দিয়ে ঢুকে প্রথম বাঁদিকের টেবিলটা বিশ্বনাথদার। বিশ্বনাথদা তার রুমালটাকে ড্রয়ারের ফাঁকে আটকে ঝুলিয়ে দিয়েছে, ফতফত করে উড়ছে, পতাকার মত। এখান থেকে দেখা যায়, দেখা যায় বিশ্বনাথদার টাকেরও একাংশ, মাথা ঝুঁকিয়ে কিছু একটা করছে। হয়ত অফিসের কাজ, হয়ত নয়। এই টেবিলটার কোনো পায়ায়, বা, খুব কাছে আর কোনো কিছুতে রোজ মচর মচর মচর করে ঘুন শব্দ করে, আর সেই শব্দটাকে অন্য সমস্ত শব্দ থেকে, লোকের কথা বা গাড়ির শব্দ, টেবিল বা ড্রয়ার সরানোর শব্দ, দূরে বাথরুমে জলের শব্দ, সব কিছু থেকে আলাদা করে কানে একটানা চিনে নিতে খুব ভালো লাগে মিহিরের, একটা সাধনা বা তপস্যা বলে মনে হয় এই ঘুনের শব্দ চিনে-নেওয়াটাকে। আজ ঘুনটা শব্দ করছেনা। কেন, ঘুনটা কি মরে গেল? কে মারল? নাকি এমনিতেই মরে গেছে — প্রাকৃতিক মৃত্যু?

রোজকার মত, আজো বিশ্বনাথদা আসা-মাত্রই সেই রসিকতাটা করল, 'কি, মিইর, বাড়ি দিয়ে এসেছো?' কোনো এক দিন বহু অযুত বছর আগে, বিশ্বনাথদা হয়ত অনেক ভেবে এই রসিকতাটাকে আবিষ্কার করেছিল। বহুমুখী একটা রসিকতা — কতগুলো অর্থ একই রসিকতার! — এই ভেবে বিশ্বনাথদা হয়ত রোমাঞ্চিত-ও হয়েছিল। অর্থ এক : স্বাভাবিক অর্থ, 'দিয়ে' শব্দটা 'থেকে' এই শব্দের চালু বাঙাল প্রতিরূপ, অর্থাৎ, বাড়ি থেকেই মিহির আসছে কিনা এই বিষয়ে প্রশ্ন। অর্থ দুই : 'বাড়ি দেওয়া' বলতে 'যৌনাঙ্গের আঘাত করা', অর্থাৎ, সঙ্গম বা যৌনক্রিয়া : মিহির আজ সঙ্গম করে এসেছে কিনা, অর্থাৎ, অফিসসুলভ একটু তির্যক অশ্লীলতা। অর্থ তিন : 'মাথায়' এই শব্দটাকে 'বাড়ি দিয়ে' অংশের আগে বুঝে নিতে হবে, অর্থাৎ, মিহির কি আজকে কাউকে কোনো কোপ দিয়ে/ ঘাড় ভেঙে/ মুরগী করে আসতে পেরেছে?

বিশ্বনাথদার এই রসিকতাটার নানা রকম উত্তর খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত মিহির আজো রোজকার মত একটু বোকা হেসেছিল। এটাই হয়ত একমাত্র উত্তর যা পুর্নবার কোনো নতুনতর এবং অভ্যস্ত রসিকতাকে আমন্ত্রণ করেনা।

বিশ্বনাথদা সবাইকেই করে এই রসিকতাটা। অফিসে বেশ ক্ষমতাবান, যোগাযোগসম্পন্ন, ট্রেড-ইউনিয়নে ক্যাচসম্পন্ন বিশ্বনাথদার সঙ্গে সকলেই সুসম্পর্ক চায়। মিহিরের মত সবাই হাসে। বা হয়ত সবাই উপভোগই করে এই রসিকতাটাকে — মিহির ঠিক জানেনা।

এই ঘুনপোকার ডাক, এই রসিকতা, এই টেবিল, ফ্যানের হাওয়ায় রুমালের ঘাম শুকোচ্ছে, এই ভাবেই চলে যাচ্ছে তার জীবন, এই ভাবেই কেটে গেল এতগুলো বছর? আর কোনো মানে নেই এর — শুধু এটুকুই? এই ভাবেই মচর মচর মচর শব্দ করতে করতে একসময় সে ফুরিয়ে যাবে? কেউ হয়ত টের পাবে — কেউ হয়ত পাবেনা। শুধু এটুকুই — এই টুকু মাত্র? আর কিছু না? মাথায় কত তরঙ্গ খেলে রোজ সকালের আলোয়, সন্ধের হাওয়ায়, বৌয়ের পিঠের খাঁজে, ছেলের চোখে, গাছের পাতা খসে পড়ায়, আকাশে মেঘ উড়ে যাওয়ায়। সব, সব কিছু একদিন শেষ হয়ে যাবে? কোনো চিহ্নই এর রয়ে যাবেনা? ছেলের কথা, খুব ছেলের কথা মনে পড়ে মিহিরের। আজ ভোরে, ব্রাহ্ম মুহূর্তেও মনে পড়ছিল। ঘুম ভেঙ্গে গেল, শেষ রাতে। ঢং ঢং শুনল চারবার। মন্দিরেই বাজে কোনো। ভোর রাত। ছেলেকে নিয়ে যাবে কোথাও? এখন এই ভোর রাতে, রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগোবে স্টেশনের মাঠের দিকে? — যেখানে খালের ওপারে সূর্যোদয় হয়? ভোর রাতে ঘুমবিহীন বিছানায় বালিশের আর গালের মধ্যে হাত রাখল মিহির। যাবে — বেরোবে? ডেকে তুলবে ছেলেটাকে?

ঘুম ফাটিয়ে ওঠা ছেলে যদি তাকে জিগেশ করে, 'কোথায়?' মিহির কী বলবে? ঘুমবিহীন শুয়ে শুয়েই মিহির উত্তর বানায়, 'চল তোকে কাক দেখতে নিয়ে যাই।'

বাইরে কোনো তারই মত ঘুম-ভাঙ্গা রাতপাখির গুবগুব ডাক। মিহির বানাচ্ছে। কথোপকথন।

ছেলে অবাক চেয়ে আছে। হয়ত ভাবল, ঘুম কি সত্যিই ভেঙ্গেছে?

'হ্যাঁ রে, চল, কাক দেখে আসি। ভোরবেলা সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে আকাশে ওড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে কাক। উজ্জ্বল কালো ডানায় আলো ঠিকরোয়। তুই কখনো সূর্যোদয়ের কাক দেখেছিস?'

ছেলে কী বলবে? ও কি তাকিয়েই থাকবে?

মিহির হাত দেয় ছেলের পিঠে। চল এগোই।

মিহির বানাতেই থাকে।

বালিশে মাথা এলায় মিহির। ছেলেকে ডেকে কী হবে? বানানোটা বেশ চলছে।